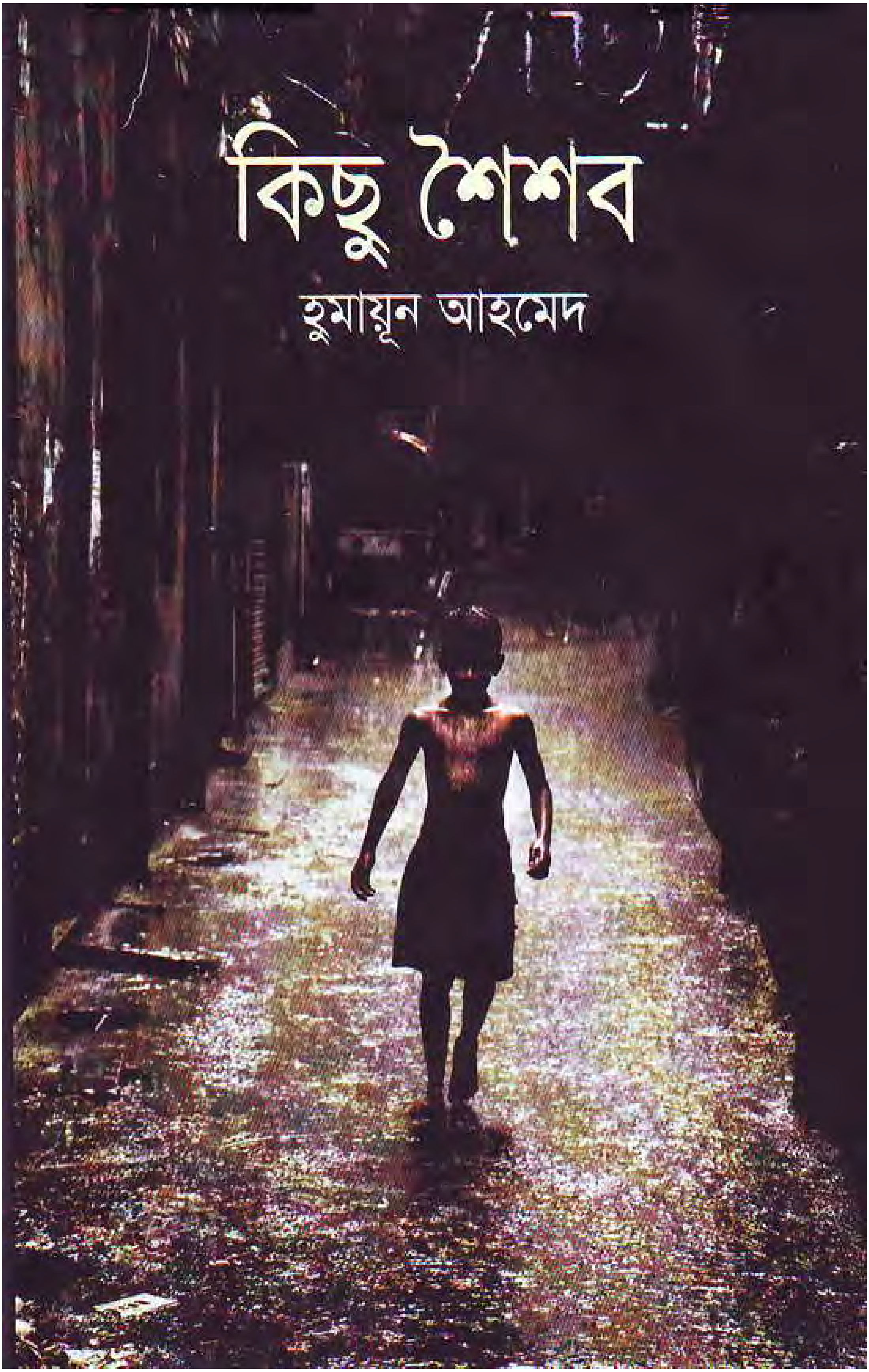
কিছু শৈশব
হুমায়ূন আহমেদ

ছয়-সাত বছরের একটি বালক জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে বৃষ্টি দেখছে। সিলেটের বিখ্যাত বৃষ্টি। ফিনফিনে ইলসেগুঁড়ি না, ঝুম বৃষ্টি। এই বৃষ্টি এক নাগাড়ে সাতদিন পর্যন্ত চলতে পারে। ছেলেটি বৃষ্টি দেখছে তবে তার দৃষ্টিতে মুগ্ধতা নেই, বিস্ময়বোধ নেই, আছে দুঃখবোধ এবং হতাশা। তাকে সারাদিনের জন্যে আটকে রাখা হয়েছে। আজ সে ঘর থেকে বের হতে পারবে না। সে একটি গুরুতর অপরাধ করেছে।...

উপন্যাস লিখছি না। নিজের শৈশবের কথাই লিখছি। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সবকিছু হুবহু মনে নেই। যে সব জায়গা মনে নেই সেসব জায়গায় Fill up the blank করেছি। লেখকের স্বাধীনতাও ব্যবহার করেছি, তবে যেটুকু না করলেই নয় শুধু ততটুকুই।

—হুমায়ূন আহমেদ

ভূমিকা

মানুষ যখন মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকে তখন সে ব্যাকুল হয়ে পেছনে তাকায়। আমার মনে হয় তাই হয়েছে। সারাক্ষণই শৈশবের কথা মনে পড়ে। কী অপূর্ব সময়ই না কাটিয়েছি!

শৈশবের খণ্ডচিত্র প্রথমে ছাপা হয়েছিল *সিলেট বাজার* পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কিছু কাটাকুটি খেলা খেলেছি।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর

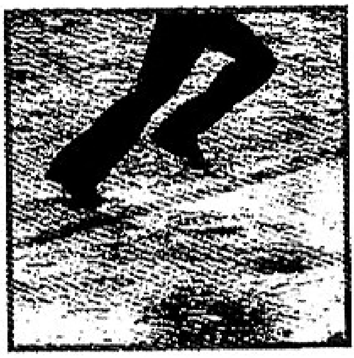

ছয়-সাত বছরের একটি বালক জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে বৃষ্টি দেখছে। সিলেটের বিখ্যাত বৃষ্টি। ফিনফিনে ইলসেগুঁড়ি না, ঝুম বৃষ্টি। এই বৃষ্টি এক নাগাড়ে সাতদিন পর্যন্ত চলতে পারে। ছেলেটি বৃষ্টি দেখছে তবে তার দৃষ্টিতে মুগ্ধতা নেই, বিস্ময়বোধ নেই, আছে দুঃখবোধ এবং হতাশা। তাকে সারাদিনের জন্যে আটকে রাখা হয়েছে। আজ সে ঘর থেকে বের হতে পারবে না। সে একটি গুরুতর অপরাধ করেছে। কাঠের সিন্দুকের উপর পাঁচটা চিনামাটির প্লেট রাখা ছিল, সবকটা একসঙ্গে ভেঙেছে। বাসায় আর কোনো প্লেট নেই।

প্রাথমিক শাস্তি চড়থাপ্পড় এক দফা হয়েছে। বালক এই ধরনের শাস্তিকে হিসাবের মধ্যে ধরে না। বালকের মাতা এই তথ্য জানেন বলে মানসিক শাস্তির দিকে গেলেন। ঘোষণা করা হলো, এখন থেকে সবাই প্লেটে করে খাবে, বালক খাবে মেঝেতে। মেঝের একটা অংশ পরিষ্কার করে রাখা হবে, সেখানেই ভাত-তরকারি দেয়া হবে।

বালক এই মানসিক শাস্তিকেও আমল দিল না। কারণ সে জানে এই কাজটি করা হবে না। সে এই বয়সেই বুঝে গেছে, বড়দের কথা এবং কাজ এক না।

একটি দরিদ্র পরিবারের কাছে পাঁচটা চিনামাটির প্লেট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এটা বোঝা গেল যখন বালককে ছুটির দিনে বন্দি করে রাখা হলো।

বন্দি ঠিকমতো শাস্তি ভোগ করছে কি-না তা তার ভাইবোনরা এবং কাজের ছেলে রফিক মাঝে-মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে। সবচে' আনন্দিত রফিক। তার মুখভর্তি হাসি। এই বাসার যে-কোনো শিশুকে শাস্তি পেতে দেখলে সে বিমল আনন্দ ভোগ করে।

দুপুরের ভাত খাবার সময় বালককে মুক্তি দেয়া হলো। সে ছুটে বের হয়ে গেল। প্রথম কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে লাফালাফি করল। তারপর দৌড়ে রাস্তা পার হলো। রাস্তার ওপাশেই মাঠ। মাঠে কিছু নিচু জায়গা আছে, সেখানে পানি

জমেছে। পানির উপর ঝাঁপাঝাঁপি করা যায়। মাথার উপর ঝুম বৃষ্টি, পায়ের নিচে পানি— কী আনন্দ!

বালককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্যে ছাতা দিয়ে রফিককে পাঠানো হলো। সে গম্ভীরমুখে কিছুক্ষণ বালকের লাফালাফি দেখল, তারপর ছাতা বন্ধ করে নিজেও ঝাঁপাঝাঁপিতে যুক্ত হলো। যুক্ত কেনইবা হবে না? রফিক বালকের চেয়ে দু'এক বছরের বড়। বৃষ্টি বিলাস থেকে সে কেন নিজেকে দূরে রাখবে!

রফিকের নেতৃত্বে বৃষ্টি যাপনের অর্থ হলো একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযান। তার একটি হচ্ছে— দেয়াল টপকে প্রফেসর সাহেবের বাড়িতে ঢোকা (অধ্যাপক এমসি কলেজ)। প্রফেসর সাহেবের বাগানভর্তি আমগাছ। ঝড়বৃষ্টিতে গাছতলায় নিশ্চয়ই অনেক আম পড়েছে।

অভিযান সফল হলো। পকেটভর্তি আম নিয়ে বালক পরবর্তী অভিযানে বের হলো। পাকা 'পুসকুনি'তে গোসল। পাকা পুসকুনিতে সবদিন স্নানের সুযোগ হয় না। বড় কেউ সঙ্গে গেলেই সুযোগ হয়। তখনো সমস্যা, বড়দের কারণে মনের আশ মিটিয়ে পানিতে ডুবাডুবি খেলা খেলা যায় না।

মহানন্দে পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপির এক পর্যায়ে রফিক লক্ষ করল, ছাতাটা সঙ্গে নেই। পরবর্তী অভিযান ছাতা খুঁজে বের করার অভিযান।

সন্ধ্যার আগে আগে তারা বাসায় ফিরল। দু'জনের মুখ শুকনা। ছাতা হারানো গেছে, না জানি কী হয়!

বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, ছাতা নিয়ে কেউ একটা কথাও বলল না। মনে হয় বাসার কেউ রফিকের ছাতা নিয়ে বের হবার বিষয়টা জানে না। সারাদিন বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে কোনো শাস্তি হলো না। পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারপতি, বালকের বাবা, অপরাধের সব ফিরিস্তি শোনার পর কিছুই বললেন না। রেডিওর নব ঘোরাতে লাগলেন। এই সময়ে 'আকাশবাণী' থেকে নাটক প্রচার হয়। তিনি নাটক শুনতেই বেশি আগ্রহী। বালক তখনো নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তার ধারণা শাস্তির ব্যবস্থা হবে রেডিওর নব ঘোরানো শেষ হবার পর। নব ঘোরানো একসময় শেষ হলো। প্রধান বিচারপতি বালকের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, দাঁড়িয়ে আছিস কী জন্যে?

বালকের মা রাগী গলায় বললেন, এতক্ষণ তোমাকে কী বললাম?

প্রধান বিচারপতি বললেন, কী বলেছ?

কী বলেছি তুমি জানো না?

না। আবার বলো।

মা উঠে চলে গেলেন। প্রধান বিচারপতি পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর মা কি রাগ করে উঠে চলে গেল ?

পুত্র হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

তোর মা'র রাগ ভাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে। জোরেসোরে বৃষ্টি নামলে বলবি— গুষ্ঠিসুদ্দ বৃষ্টিতে ভিজব। বৃষ্টিতে ভিজলে কী হয় জানিস ?

না।

গায়ের ঘামাচি মরে। তোর কি ঘামাচি আছে ?

গাভর্তি ঘামাচি।

কোনো চিন্তা নাই, ঘামাচি ধ্বংসের ব্যবস্থা করছি। বৃষ্টিটা ভালোমতো নামতে দে।

পাঠক, উপন্যাসের মতো কি লাগছে ? মনে হচ্ছে কি ঔপন্যাসিক একটা পারিবারিক উপন্যাস ফেঁদেছেন ? কিছুক্ষণের মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা ঘটবে। কাহিনী এগুবে তরতর করে।

উপন্যাস লিখছি না। নিজের শৈশবের কথাই লিখছি। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সবকিছু হুবহু মনে নেই। যে সব জায়গা মনে নেই সেসব জায়গায় Fill up the blank করেছি। লেখকের স্বাধীনতাও ব্যবহার করেছি, তবে যেটুকু না করলেই নয় শুধু ততটুকুই। উদাহারণ দেই— সারাদিন রফিককে নিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা, ছাতা হারানো, সব ঠিক আছে। এত বড় অপরাধের পর কোনো শাস্তি হয় নি, তাও ঠিক আছে। শাস্তির বদলে ঐ রাতেই যে আবারো সবাই মিলে বৃষ্টিস্নান উৎসব করেছে, তাও ঠিক আছে। শুধু শাস্তি-বিষয়ক কথোপকথন তৈরি করা— কারণ কেন শাস্তি হয় নি সেটা মনে করতে পারছি না।

বৃষ্টিভেজা মীরাবাজার

আমার স্মৃতির শহর কিন্তু পুরো শহর না, শহরের ছোট্টখানিকটা জায়গা— মীরাবাজারের এক অংশ, যেখানে আমি একা একা ঘুরতে পারি। সিলেটের কথা মনে হলে মীরাবাজারের কথাই মনে হয়। যে মীরাবাজার বৃষ্টিতে ভিজছে। মীরাবাজারের সঙ্গে ভিজছে এক অতি দুরন্ত বালক। তার সে-কী আনন্দ!

পঞ্চাশ বছর পর হঠাৎ করে একদিন মনে হলো, বৃষ্টির সময় একবার মীরাবাজারে গেলে হয় না! ঐ বালকের মতো আমিও বৃষ্টিতে ভিজব। নানান কাজে অনেকবার সিলেটে গিয়েছি। তখন বৃষ্টি হয় নি বলে মীরাবাজারে যাওয়া হয় নি। একবার বৃষ্টি শুরু হলো রাত তিনটায়। রাত তিনটায় নিশ্চয়ই কেউ স্মৃতি অনুসন্ধানী মিশন নিয়ে বের হয় না।

আসাদুজ্জামান নূর সাহেবের কী একটা প্রোগ্রামে সিলেট গিয়েছি। সকাল থেকেই বৃষ্টি। আমি বের হলাম মীরাবাজারের খোঁজে। কোনো কিছুই চিনতে পারলাম না। আমাদের বাসার সামনেই গরম পীরের মাজার নামে একটা মাজার ছিল— সেটা পাওয়া গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য পরিবর্তন! মাজারের পাশে ছোট্ট একটা গাছভর্তি টিলা ছিল। টিলা নেই। মাজারের একপাশে ফাঁকা মাঠ ছিল। মাঠ নেই। আমাদের বাসাটা কোথায় থাকতে পারে— এই নিয়ে অনেক হিসাব অনেক অনুমান করে যাচ্ছি। বৃষ্টি গেল থেমে। স্মৃতির বাসা খুঁজব, না ফিরে যাব? পঞ্চাশ বছর আগের ভাঙা একতলা বাড়িটা থাকার কথা না। চারদিকেই উঁচু উঁচু ঝকঝকে দালান। সিলেটিরা অর্থবান। জমি কিনতে এবং দালান বানানোয় তাদের ঝোঁক আছে।

আমার কৌতূহল জয়ী হলো। বাসা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। ইঁদারাওয়ালা ছোট্ট বাড়িটার কী পরিবর্তন হয়েছে সেটাও দেখা যাক।

সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করে একটা পাঁচিলঘেরা বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ দরজা খুললেন।

সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তিনি তাকাচ্ছেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমি কি একমিনিটের জন্যে আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারি ?

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তীক্ষ্ণগলায় বললেন, কেন ?

আমি বললাম, আমার ধারণা অনেককাল আগে এই বাড়িটায় আমরা থাকতাম।

আপনার পরিচয় ?

আমি নাম বললাম। তাকে দেখে মনে হলো এই নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। এই বয়সের মানুষ হাদিস-কোরান পড়েন। তাঁরা গল্পের বই পড়া বা নাটক সিনেমা দেখা থেকে দূরে থাকেন। আমার অনুমান ভুল প্রমাণিত হলো। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন, আপনার বাড়ি যেমন ছিল আমি তেমন রেখে দিয়েছি। এই বাড়িটা ঠিক রেখে অন্যদিকে দালানকোঠা করেছি। আমি আমার ছেলেমেয়েদের বলে দিয়েছি, যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন হুমায়ূন সাহেবের বাড়ি ভাঙা হবে না। আসুন ভিতরে।

বাড়িতে পা দিয়ে আমি হতভম্ব। ঐ তো কুয়াতলা। ঐ তো আমাদের শোবার ঘর, ঐ তো বারান্দা। বড়মামা যে-কামরায় থাকতেন শুধু সেই কামরার মেঝেতে বিকটদর্শন অদ্ভুত এক যন্ত্র। এটা না-কি আতর বানানোর যন্ত্র। বৃদ্ধ আতর বানান। আমি বললাম, কুয়াতলায় একটু বসি।

উনি চেয়ার আনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার আগেই কুয়ায় হেলান দিয়ে আমি বসে পড়েছি। আমি খুব বিব্রতও বোধ করছি। কারণ আমার

(বাঁয়ে) মীরাবাজারের এই বাড়িতেই কেটেছে শৈশব। (ডানে) মীরাবাজারের সেই বাড়ির জায়গায় এখন উঠছে বহুতল ভবন

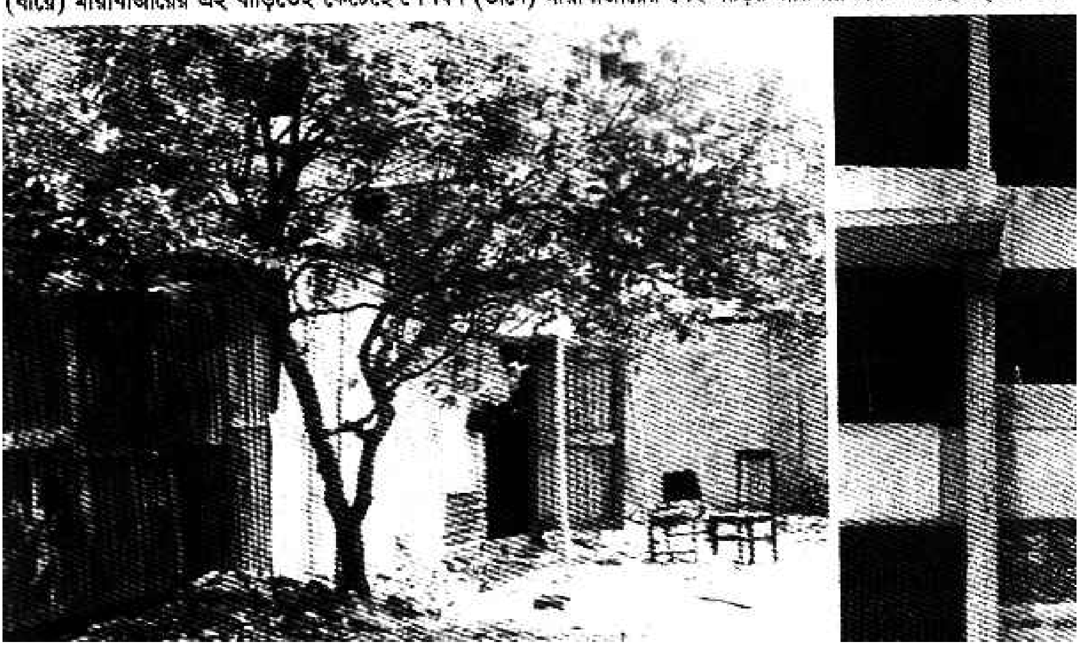

চোখভর্তি জল। এদিকে আশেপাশের বাড়িতে খবর চলে গেছে। তরুণ এবং তরুণীরা আসতে শুরু করেছে। কারো কারো হাতে অটোগ্রাফের খাতা। তারা হয়তো তাদের লেখককে কাঁদতে দেখে মজা পাবে, আমি সেরকম মজা পাব না।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের নাম আজিজুর রহমান। তিনি তাঁর জীবৎকালে হুমায়ূন আহমেদ যে বাড়িতে থাকত সেটি ভাঙেন নি। অল্প কিছুদিন হলো তিনি মারা গেছেন। আমার স্মৃতির বাড়িটি ভেঙে নতুন দালান উঠেছে। আমি চলে আসার সময় বৃদ্ধ ছুটে গিয়ে এক শিশি আতর এনে পুরোটাই আমার গায়ে ঢেলে দিলেন।

আমি অকৃতী এবং অধম, তারপরেও পরম করুণাময় আমাকে অনেক দিয়েছেন। এক বৃদ্ধ বাড়ি আগলে রেখে অপেক্ষা করেছেন হুমায়ূন আহমেদ আসবে, তার প্রতীক্ষা।

হে পরম করুণাময়, যে বৃদ্ধ হৃদয়ের মমতায় আমার গায়ে আতর ঢেলে দিয়েছেন, তুমি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে আতরের পবিত্র সৌরভে সুরভিত করে দিও। আমিন।

শুধুই খেলা

একালের শিশুদের জীবন থেকে খেলা কি নির্বাসিত ? আমি যে অ্যাপার্টমেন্টে বাস করি সেখানকার শিশুদের মাঝে মাঝে দেখি পার্কিং লটে শুকনামুখে হাঁটাহাঁটি করতে। তাদের সঙ্গে খবরদারির জন্যে বুয়া থাকে। বুয়াদের মুখে আনন্দ থাকে, শিশুদের মুখে থাকে না। গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়ায় শিশুরা কী খেলে কে জানে! তাদের খেলার সময়ইবা কোথায় ? ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ। সেই চাপ আটকাতে বাড়িতেও চাপ। এক্সট্রা কোচিং, প্রাইভেট স্যার। আমি একটি ছেলেকে চিনি, যার জন্যে তিনজন প্রাইভেট টিচার। সে পড়ে ক্লাস টু'তে। এই বাচ্চাটার দম ফেলার সময় পর্যন্ত নেই। এরা কি কখনো নিশ্চিন্ত মনে খোলা আকাশ দেখেছে ? অবারিত মাঠে হেঁটেছে ? প্রবল বৃষ্টিতে ঝাঁপাঝাঁপি করেছে ?

সেই সুযোগ তাদের নেই। তারা খাঁচার বন্দি জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। খাঁচা থেকে বের করে আনলেই তারা বরং ভয় পাবে। অথচ আমাদের সময়টা কী সময়ই না ছিল! পুরো মীরাবাজারটাই যেন আমার বাড়ি। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। যে-কোনো অচেনা ঘরে ঢুকে যেতে পারি। অচেনা ঘরের অচেনা শিশুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলে চলে আসতে পারি। গৃহকর্ত্রী একবার শুধু উদাস গলায় জিজ্ঞেস করবে— 'তুমি কোন বাড়ির ? নাম কী ?' খেলতে খেলতে বেলা হয়ে গেছে, গৃহকর্ত্রী অবশ্যই তার বাড়িতে ঢুকে পড়া ছেলেটিকে আদর করে খাওয়াবে।

আমাদের সময়ের মায়েরাও ছিলেন অন্যরকম, শিশুদের বিষয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরলেই হলো। মাঝে-মাঝে শাসন না করলে সন্তান বিগড়ে যাবে, এই কারণে কিছু শাস্তি হতো। অকারণে চড়থাপ্পড়। যে শাস্তি পাচ্ছে সে ধরে নিচ্ছে এই শাস্তি জীবনেরই অংশ। এই শাস্তিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেবার কিছু নেই।

খেলা প্রসঙ্গে আসি। তখনকার শিশুরা কী খেলত ? সরঞ্জামবিহীন খেলা। মার্বেলের চল ছিল। তবে কোনো এক বিচিত্র কারণে মার্বেল বস্তুটিকে অভিভাবকরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। পকেটে মার্বেলের ঝনঝন শব্দ হলেই অবধারিত শাস্তি। এবং মার্বেল বাজেয়াপ্ত। মীরাবাজারের বাসার কুয়ায় অনেক মার্বেলের সলিল সমাধি হয়েছে। সব মার্বেলই কাজের ছেলে রফিকের জিতে আনা। ওর টিপ ছিল বিশ্বমানের। অলিম্পিকে মার্বেল খেলার ইভেন্ট থাকলে রফিক অবশ্যই সোনা জিতত।

মার্বেলের কাছাকাছি আরেকটা খেলা ছিল, চাড়া খেলা নাম। সাতটা মাটির বাসন ভাঙা চাড়া একের উপর এক সাজিয়ে দূর থেকে নিশানা করে মেরে সপ্তসৌধ ভেঙে দেয়া। এই খেলায় আমি মজা পেতাম না, কারণ আমার নিশানা ভালো না।

সিগারেটের খালি প্যাকেট দিয়ে একটা খেলা ছিল। চাড়া খেলারই অন্য ভার্সান। এই খেলায় টাকাপয়সা লেনদেন হতো। টাকাপয়সা মানে সিগারেটের প্যাকেট। ক্যাপসটেন সিগারেটের প্যাকেটের মূল্যমান একশ' টাকা, সিজার সিগারেটের প্যাকেট পঞ্চাশ টাকা। সবচে' দামি ছিল থ্রি ক্যাসেল সিগারেটের প্যাকেট। খুবই কম পাওয়া যেত বলে এর দাম দিল পাঁচ হাজার টাকা। আমরা শিশুরা যখন খেলতে যেতাম আমাদের চোখ থাকত রাস্তায়, ডাস্টবিনে। যদি কোনো খালি প্যাকেট পাওয়া যায়!

একদিনের ঘটনা বলি। গরম পীরের মাজারের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি রাস্তায় কী যেন চকচক করছে। দূর থেকে থ্রি ক্যাসেল সিগারেটের প্যাকেটের মতো দেখাচ্ছে। আসলেই কি তাই ? আমি ছুটে গেলাম। যা ভেবেছি তাই। আমার হাত-পা গেল ঠাণ্ডা হয়ে। বুক ধ্বক ধ্বক করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। এত সৌভাগ্য কারো হয় ?

একবার এক পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে আমি আমার জীবনের কিছু আনন্দময় অলৌকিক মুহূর্তের কথা বলেছিলাম। যেমন, নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির রসায়ন বিভাগের দীর্ঘ করিডোরে আমি হাঁটাহাঁটি করছি। টেনশনে অস্থির। কিছুক্ষণ আগেই আমি Ph.D'র ভাইবা দিয়েছি। বিচারকরা এখন রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন। বৈঠক শেষে জানাবেন আমাকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া যাবে কি যাবে না। একসময় দরজা খুলল। বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর জেনো উইকস গম্ভীর ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হ্যালো ডক্টর হুমায়ূন। মুহূর্তটা ছিল অলৌকিক।

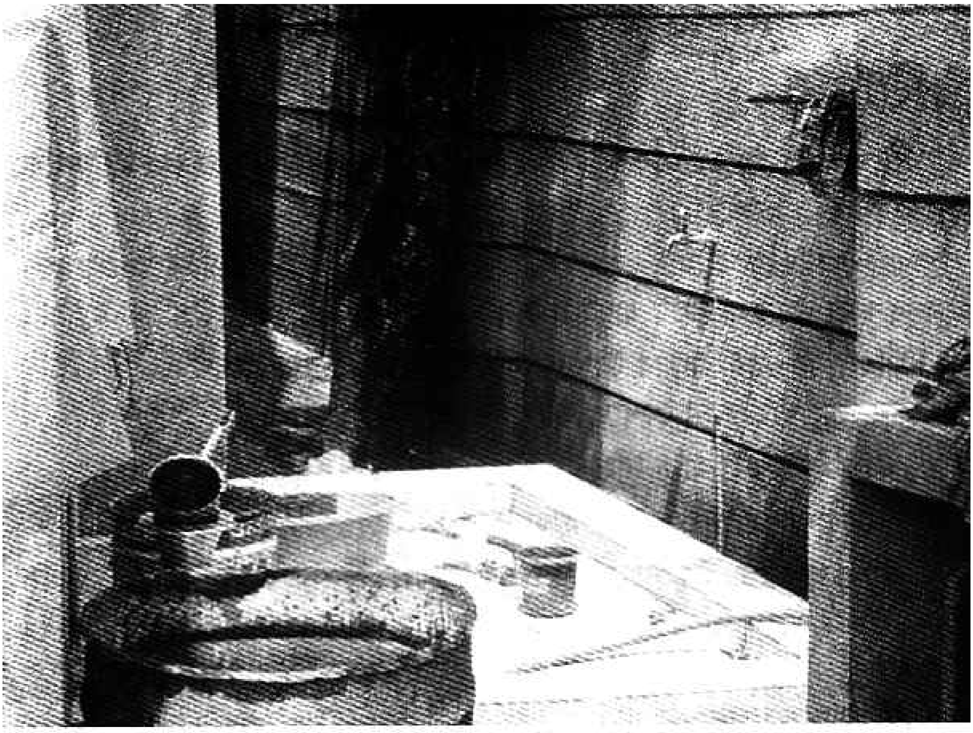

ইট, চুন, সুরকিতে তৈরি এই কলতলাতেই ছিলো একটি কুয়া (কূপ)।

আরেকটা বলি। আমার প্রথম মেয়ে নোভার জন্ম হয়েছে ধানমণ্ডির কোনো এক ক্লিনিকে। আমি আমেরিকায়। ক্লিনিক থেকে তার জন্মসংবাদ আমাকে দেয়া হলো। মেয়ে নাকি জন্মের পর থেকে কেঁদেই যাচ্ছে। আমি টেলিফোনটা মেয়ের কাছে নিয়ে যেতে বললাম, তার কান্না যদি শোনা যায়। তার মা তাই করল, আমি মেয়ের কান্না শুনলাম। আহা কী আনন্দময় অলৌকিক মুহূর্ত!

আমরা যখন জীবনের হিসাব মেলাই তখন শৈশবের অলৌকিক আনন্দময় অংশটা বাদ থাকে। বাদ থাকে বলেই লেখক হুমায়ূন আহমেদের অলৌকিক আনন্দময় মুহূর্তের যে তালিকা পত্রিকাওয়ালারা ছাপে তাতে থ্রি ক্যাসেল সিগারেটের প্যাকেট প্রাপ্তির অলৌকিক আনন্দের কথা থাকে না।

শৈশবের একা হাঁটাহাঁটি, এর-তার বাড়িতে ঘরের ছেলের মতো ঢুকে যাওয়ায় জীবনকে কত বিচিত্র মহিমাতেই না দেখার সুযোগ হলো! একটা উল্লেখ করি।

গরম পীরের মাজারের পেছনে একটা টিনের বাড়ি ছিল। চারদিকে টিনের বেড়া। উঠোন ঝকঝকে তকতকে। এই বাড়িতে আমার খেলার বয়েসি কেউ নেই বলে কখনো যেতাম না। একদিন কী মনে হলো, বাড়িতে ঢুকলাম।

ঢুকেই চমকালাম। রূপবতী এক মহিলা উঠোনে বসে তার শিশুসন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন। তাঁর বুকের কাপড় সম্পূর্ণ খোলা। একটা বাচ্চাছেলেকে দেখে তিনি নির্বিকার রইলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে দৃশ্যটা দেখছি। মুগ্ধ হবার প্রধান

কারণ, বাচ্চাটা মায়ের এক বুক থেকে দুধ খাচ্ছে আর অন্যটা থেকে ফিনকি দিয়ে দুধ বের হচ্ছে।

এরপর থেকে আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল, এই বাড়িটির আশেপাশে ঘুরঘুর করা। মহিলা যখন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান তখন সামনে উপস্থিত হওয়া।

মহিলা নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ একদিন তিনি বললেন, দুধ খাওয়ানো দেখতে ভালো লাগে?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন, দুধ খাইতে ইচ্ছা করে?

আমি আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। মহিলার ঠোঁটে হাসির আভাস দেখা গেল। তিনি পাশে রাখা একটা কাপ তাঁর খালি বুকের সামনে ধরলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপ অর্ধেকের মতো ভরে গেল। তিনি কাপ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে খা।

আমি আগ্রহ নিয়ে খেলাম।

তিনি বললেন, রোজ আইসা দুধ খাইয়া যাবি। কাউরে এই ঘটনা বলবি না।

আমি দুর্বোধ্য এই ঘটনা কাউকে বলি নি এবং সেই বাড়িতে আর কোনোদিনও যাই নি। কেন যাই নি সেটাও এক রহস্য।

প্রাণসখা

শৈশব ও কৈশোরে প্রাণসখা হয় না। খেলার সাথি হয়। শৈশবের বন্ধুদের কথা এই কারণেই কারো মনে থাকে না। খেলা শেষ, বন্ধুত্বও শেষ। আমি অনেক চেষ্টা করেও খেলার সাথিদের নাম মনে করতে পারছি না। একজন ছিল শঙ্কর (মাথামোটা শঙ্কর নামে তাকে ডাকা হতো), তার কথা 'আমার ছেলেবেলা' বইটিতে বিস্তারিত লিখেছি। জীবন তার প্রতি করুণা করে নি। পত্রিকার হকার এবং বাদামওয়ালা হয়ে সে কোনোক্রমে জীবন টেনে নিচ্ছিল। বছর দুই আগে পত্রিকায় পড়লাম শঙ্কর খুন হয়েছে। তার মৃতদেহ ভেসে উঠেছে এক পানাপুকুরে। কে বলবে এটাই হয়তো সেই পুকুর যেখানে আমি শঙ্করকে নিয়ে দাপাদাপি করে শৈশব যাপন করেছি।

টগর নামের এক খেলার সাথির কথা মনে পড়ছে। আমার চেয়ে সে বছর খানিকের বড়। খেলাধুলায় অপটু, মারামারিতে অতি দুর্বল। দুর্বলরা কথাবার্তায় দড় হয়, সেও তাই ছিল। সারাক্ষণ উপদেশ এবং জ্ঞান বিতরণ। আমাকে সে একদিন গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার গায়ের রঙ কালো, কারণ আল্লাহ্ আমাকে মাটি দিয়ে বানিয়েছেন। আর তোমার গায়ের রঙ শাদা, কারণ তোমাকে গু দিয়ে বানিয়েছেন। ভালো করে হাত শুঁকে দেখ গুয়ের গন্ধ পাবে।' (যারা আমাকে সামনা সামনি দেখেছেন তাঁরা জানেন আমার গাত্রবর্ণ কালো। মনে হচ্ছে শৈশবে ফর্সাভাব ছিল) যাই হোক পুরনো প্রসঙ্গে যাই। টগরের কথামতো আমি আমার হাত শুঁকলাম এবং গুয়ের গন্ধ পেলাম। কী সর্বনাশ! বন্ধুবান্ধব যাদের গাত্রবর্ণ গৌর তাদের সবার গায়েই গুয়ের বদ গন্ধ! টগরের কথা বিশ্বাস হলো। কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরে মা'কে জিজ্ঞেস করলাম, মা, আমাকে কি আল্লাহ্ গু দিয়ে বানিয়েছেন ? বাসায় বিরাট হাসাহাসি পড়ে গেল। আমার মা তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে কোনো গল্প বলতে গেলেই এই গল্পটা করেন।

টগরের জ্ঞান বিতরণের আরেকটি গল্প বলি। একদিন সে সবাইকে ডেকে বলল, মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়ে যেতে দেখলেই সবাই যেন দৌড়ে বাড়িতে

ঢুকে পড়ে কিংবা গাছতলায় দাঁড়ায়। কারণ প্লেনের যাত্রীদের পেসাব পায়খানা সব নিচে পড়ে। ট্রেনের বাথরুম যেমন প্লেনের বাথরুমও সেরকম নিচে ফুটো।

এরপর থেকে আকাশে বিমান দেখা গেলে কিংবা বিমানের শব্দ পাওয়া গেলেই শিশুদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য এবং শঙ্কা দেখা দিত। কোনোক্রমে দৌড়ে গাছতলায় আশ্রয় নেয়া। একবার সবাই দৌড়াচ্ছি গাছতলার দিকে, এক পথচারী জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আমাদের মধ্যে একজন জবাব দিল, আকাশ থেকে গু পড়ছে। পথচারী বললেন, কী সর্বনাশ আসমানের গু! তিনিও ছুটতে শুরু করলেন। কী সব রঙিন দিনই না গিয়েছে!

আমার এক সঙ্গী ছিল, গাট্টাগুট্টা, বেঁটে, দৌড় চ্যাম্পিয়ান। মুহূর্তের মধ্যে ভোঁ দৌড় দিতে পারত। ছেলেটির নাম মনে করতে পারছি না, তবে তার উজ্জ্বল মুখ এখনো চোখে ভাসছে। এই ছেলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক খেলা বের করে শিশুমহলে বিরাট হৈচৈ ফেলে দিল। এমন উদ্ভাবনী খেলার নজির পাওয়া ভার। খেলাটা ব্যাখ্যা করি। কল্পনা করুন, কোনো এক ভদ্রলোক বাজার নিয়ে ফিরছেন। তখনকার বাজার একটু অন্যরকম ছিল। আজকাল যেমন মাছ-সবজি এক ব্যাগে থাকে তখন তা করা হতো না। মাছের আঁশটে গন্ধ যেন অন্য কিছুতে না লাগে তার ব্যবস্থা করা হতো। মাছ দড়িতে ঝুলিয়ে এক হাতে নেয়া হতো, অন্য হাতে আনাজের ব্যাগ।

সেই ভদ্রলোক মাছ হাতে ঝুলিয়ে অন্য হাতে ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আমার সেই বন্ধু উল্কার বেগে ভদ্রলোকের দিকে ছুটে গেল। এক হ্যাঁচকা টানে তার হাত থেকে মাছ কেড়ে নিয়ে ডাবল উল্কার বেগে হাওয়া। ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। বিপদ বুঝে আমরাও দৌড়।

ঘটনার উত্তেজনায় আমরা বিমোহিত। কী অসম্ভব ঘটনা! কী উত্তেজনা। মাছটা কিছুক্ষণ সবার হাতে হাতে ঘুরল, তারপর আমরা সেই মাছ কুয়ায় ফেলে ভদ্রছেলের মতো যে যার বাড়িতে ফিরে গেলাম, যেন কিছুই ঘটে নি।

এই অতি বিপদজনক খেলা নিত্যদিন হওয়ার জিনিস না। নিত্যদিন হতোও না। হঠাৎ মক্কেল পাওয়া যেত, যে আমাদের পাড়ার না, বাইরের। অল্পবয়েসি জোয়ান ছেলে না, বুড়ো মানুষ, যিনি মাছ চোরের পেছনে দৌড়াতে পারবেন না, সে-রকম কাউকে পেলে আমাদের চোখে চোখে ইশারা খেলে যেত। টগর উঠে চলে যেত, কারণ সে ভালো দৌড়াতে পারে না এবং এই খেলাটা তার পছন্দ না।

মাছ-খেলা কতবার খেলা হয়েছে বলতে পারব না, তবে তিন-চারবারের বেশি না। এই তিন-চারবারই কিন্তু যথেষ্ট। খেলায় যে উত্তেজনা পেয়েছি তার

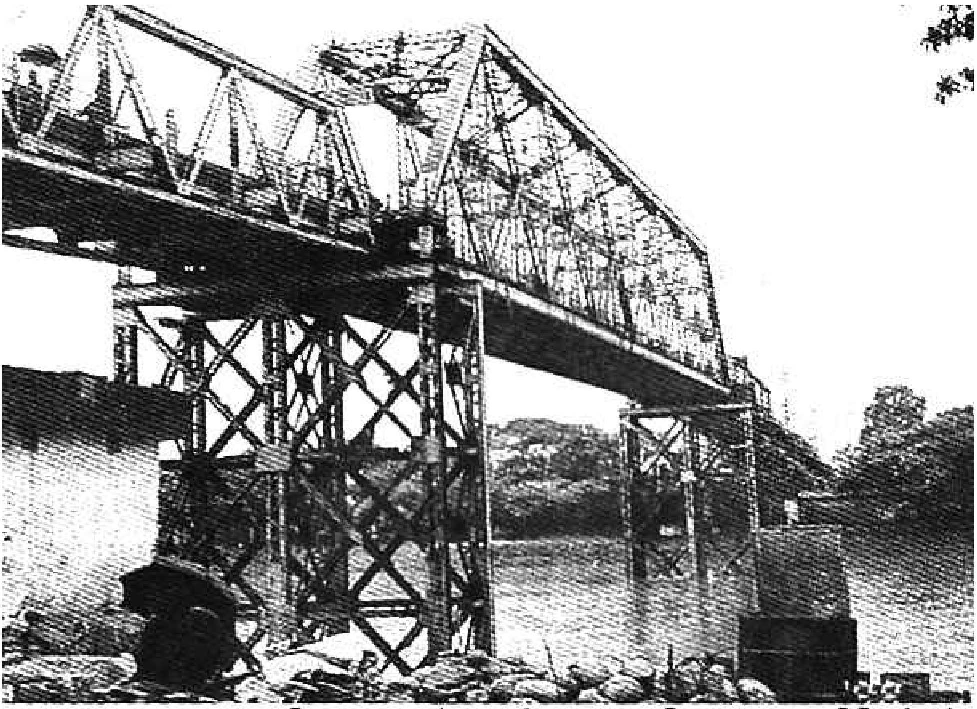

এক সময়ের প্রমত্তা সুরমা নদী এখন তার জৌলুস হারিয়েছে। স্রোতহীন সুরমার বুকে শ্রীহীন বিবর্ণ দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী ঐতিহাসিক ক্বীন ব্রীজ।

তুলনা শুধুমাত্র রোলার কোস্টার রাইডের সঙ্গেই হতে পারে। শোঁ শোঁ করে রোলার কোস্টার নামছে। উত্তেজনায় গা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, সেই সঙ্গে কী আনন্দ!

মাছ-খেলা কীভাবে বন্ধ হলো এই গল্পটা বলি। এবারে আমাদের মক্কেল জরাজীর্ণ প্রৌঢ়। চোখে চশমা। কুঁজো হয়ে হাঁটছেন। আস্তে আস্তে পা ফেলছেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি থেকেই বলে দেয়া যায় তিনি শান্ত মানুষ। শিশুদের পেছনে ছুটে বেড়াবার মানুষ না। মাছ চোর খেলার লিডার শিকারের দিকে এগিয়ে গেল। তার টেকনিক এখন অনেক উন্নত। আগে সে দৌড়ে যেত। এখন দৌড়ে যায় না। শিকারের পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ হেঁটে হঠাৎ মাছ ধরে টান দেয়।

এইবার এই কাণ্ড ঘটল। তবে আমাদের লিডার হ্যাঁচকা টানে মাছ ছুটাতে পারল না। বৃদ্ধ বেশ শক্ত করেই মাছের দড়ি ধরে রইলেন। আমাদের লিডারের উচিত ছিল মাছ ছেড়ে দিয়ে চলে আসা। সে তা না করে দড়ি টানাটানি খেলার মতো মাছ টানাটানি করতে লাগল। প্রৌঢ় খুবই অবাক হয়ে বললেন, তোমার ঘটনা কী ? মাছ ধরে টানতেছ কেন ? তুমি কোন বাড়ির ছেলে ? মাছটা পছন্দ হয়েছে ? বাসায় নিতে চাও ? আচ্ছা যাও নিয়ে যাও।

লিডার মাছ নিয়ে বিষণ্ন মুখে ফিরে এলো। এইবার দৌড়ে এলো না। প্রৌঢ় চশমার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমাদের মধ্যে মাছ নিয়ে

কোনো উত্তেজনা তৈরি হলো না। বরং বিষাদ ভর করল। ঈশপ সাহেব বেঁচে থাকলে এই গল্প শুনলে সুন্দর কোনো মরাল বের করতেন। আমি পারছি না।

মাছ চোর লিডার কিছুদিন পর আরেকটা খেলা আবিষ্কার করল। মানুষের জিনিসপত্র কুয়ায় ফেলা দেয়া। তখনকার সিলেট শহরে বাড়িতে বাড়িতে কুয়া ছিল। প্রতিটি কুয়াই ছিল যথেষ্ট গহীন। কুয়াতে কিছু ফেললে পর কুয়ার ভেতর থেকে শব্দ পাওয়া যেত। শব্দ কখন শোনা যাবে, প্রতীক্ষার সেই সময়টাই ছিল উত্তেজনার।

একদিন উত্তেজনা অনেকদূর বাড়াবার ব্যবস্থা হলো। আমাদের লিডার কুয়ার ভেতর জ্যান্ত মুরগি ফেলে দিল। মুরগির পাখা ঝাপটানো, চিৎকারে হৈচৈ পড়ে গেল। কুয়ার পাড়ে আমাদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে খবর রটে গেল, একটা বাচ্চা পানিতে পড়ে গেছে। সব মায়েরা ছুটে এসে যার যার বাচ্চা জড়িয়ে ধরলেন। এরপর শুরু হলো মুরগি উদ্ধার অভিযান। কুয়াতে বালতি নামানো হলো। বালতি দেখে মুরগি যখন লাফ দিয়ে উঠবে, তাকে তখন টেনে তোলা হবে। মুরগি বালতিতে উঠল ঠিকই, কিন্তু বালতি কিছুদূর টানার পরই সে ঝাঁপ দিয়ে বালতি থেকে পানিতে পড়ে গেল। যতবার বালতি নামানো হয় ততবারই এই অবস্থা। দর্শকদের কী উত্তেজনা!

আমাদের এই নেতা আরো নতুন নতুন খেলা বার করার আগেই হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল। আমরা বিরাট ধাঁধায় পড়ে গেলাম। যে বাড়ি থেকে সে আসত (পুকুরপাড়ের এক টিনের বাড়ি) সেই বাড়ি তালাবন্ধ। এই বাড়ি দীর্ঘদিন তালাবন্ধ থাকল। একসময় তালায় জং ধরল। টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকালে দেখা যায়, বাড়ির উঠানে ঘাস গজিয়েছে। আমি কী কারণে জানি না প্রায়ই ঐ বাড়ির ভেতর দেখার জন্যে টিনের ফুটা দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আমার রোমাঞ্চ বোধ হতো। মনে হতো কিছু একটা দেখব। কিছু একটা দেখব। কী দেখার প্রত্যাশা ছিল সেটা এখন আর মনে নেই।

আমার আরেক বন্ধুর কথা বলি। তার নাম খুব সম্ভবত মতি বা মতিন। তার বাবা লন্ডনি। অর্থাৎ লন্ডনে থাকেন। স্ত্রীকে প্রতিমাসে খরচ পাঠান। মতিনের অবস্থা সেই কারণে ভালো। তাকে দেখলেই মনে হয় সে নতুন কাপড় পরে বিয়ে বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মধ্যে একমাত্র সে সবসময় জুতা পরে বের হতো। রোগা দুর্বল ধরনের মেয়েলি চেহারার ছেলে। তার মুখে সারাক্ষণই হাসি। তার প্যান্টের পকেট ঝকঝকে নতুন মার্বেলে ভরতি থাকত। তবে সে নিজে মার্বেল খেলত না। একদিন সে বলল, ম্যাজিক দেখাবে। আমরা অতি আগ্রহে তাকে ঘিরে ধরলাম। সে একটা মার্বেল মুখে পুরলো। পরক্ষণেই হা করে দেখাল মুখে মার্বেল নেই।

আমরা অবাক হলাম না। বোঝাই যাচ্ছে সে মার্বেল গিলে ফেলেছে। তাকে চেপে ধরতেই সে স্বীকার করল। আমরা বললাম, এই ম্যাজিকটা আবার দেখব। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে আরেকটা মার্বেল গিলল। আমরা মহাআনন্দিত। বিপুল করতালি। এর পর থেকে তার প্রধান কাজ হলো, মার্বেল গিলে আমাদের আনন্দ দেয়া। মতির সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এক ভোরবেলায় লন্ডন থেকে তার বাবা চলে এলেন। মতি পেটভর্তি মার্বেল নিয়ে বাবার সঙ্গে লন্ডন চলে গেল। মতির বাবা কোনো এক কারণে (শিশুদের কাছে দুর্বোধ্য) মতির মা'কে সঙ্গে নিলেন না। সেই মহিলা চিৎকার করে এমন কান্না শুরু করলেন যে, বাড়িতে কাক নেমে গেল। গভীর বেদনায় চিৎকার করে কেউ কাঁদলে ঝাঁক বেঁধে কাক নেমে আসে এমন লোকজ প্রবাদ আছে। প্রবাদের সত্যতা থাকতে পারে।

এই মহিলা অনেক দিন কাঁদলেন। আমরা তাঁর কান্নায় অভ্যস্থ হয়ে গেলাম। ধরেই নিলাম, ঐ বাড়ির আশেপাশে গেলেই কান্নার শব্দ পাওয়া যাবে। মানুষ অসাধারণ অনেক ক্ষমতার অধিকারী। মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার একটি হচ্ছে, দ্রুত অভ্যস্থ হওয়ার ক্ষমতা।

ছেলেবন্ধুদের কথা অনেক লিখলাম, আরো লেখা যেত, তবে বিশেষ করে আর কারো কথা মনে পড়ছে না। জ্ঞানী টগরকে দিয়ে ছেলেবন্ধুদের প্রসঙ্গ শেষ করি। টগর একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মেয়েদের পেট থেকে বাচ্চা কীভাবে বের হয় জানিস ?

আমি বললাম, জানি।

জানলে বল কীভাবে বের হয়।

আমি বললাম, পেট কেটে বের করা হয়।

তুই কিছুই জানিস না, বাচ্চা বের হয় পাছা দিয়ে। পাছা দিয়ে গু যেমন বের হয়ে তেমন।

জ্ঞানী টগরের কাছ থেকে বাচ্চা বের হবার প্রক্রিয়া শুনে দীর্ঘদিন মনকষ্টে ছিলাম। ছয়-সাত বছরের বালকের কষ্ট সহজ কষ্ট না।

আমার মেয়েবন্ধুর সংখ্যা খারাপ ছিল না। তারা বাস করত উত্তেজনাহীন এক জগতে। তাদের খেলা রান্নাবাটি খেলা। ভবিষ্যতে রান্নাবাটি করতে হবে তারই প্রস্তুতিমূলক খেলা কিনা কে জানে। রান্নাবাটি খেলায় ছেলেদের প্রয়োজন হয়। যেমন বাজার করার জন্যে কাজের লোক লাগে। বাড়ির সাহেব লাগে। আমার ভূমিকা বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির চাকরের। বাড়ির কর্ত্রী কী কী আনতে হবে বলে আমাকে বাজারে পাঠান। আমি কিছু লতাপাতা, মাটি, ইটের গুঁড়া

নিয়ে ফিরে আসি। তখন বাড়ির কর্ত্রী আমাকে বকাঝকা করেন, মাছ পচা, চাল ভালো না, চালে কংকর এইসব। আমাকে মাথা নিচু করে বকা শুনতে হয়। কিছুক্ষণ পর মেয়েরা রান্না শুরু করে মুখে ছ্যাঁক ছ্যাঁক জাতীয় নানান শব্দ করে। আমি বসে থাকি, কখন রান্না শেষ হবে, নকল খাওয়া খাব।

হৈচৈ মারামারির তুমুল উত্তেজনায় খেলার পর রান্নাবাটির মতো পানসে খেলায় আমার আনন্দ পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আমি আনন্দ পেতাম। কেন পেতাম বলতে পারব না। সব মেয়ের ভেতর যেমন একজন পুরুষ বাস করে, সব ছেলের মধ্যেও একটি নারী বাস করে। নারী-পুরুষের বিভাজন রেখা দুর্বল।

মেয়েদের মধ্যে সবচে' বেশি যার কথা মনে আছে তিনি পারুল আপা ('আমার ছেলেবেলা'তে উনার কথা লিখেছি)। তাঁর চেহারা মনে নেই। ফর্সা লম্বাটে মুখ— এইটুকু শুধু মনে আছে। পারুল আপা ক্লাস সিক্সে কিংবা সেভেনে পড়তেন। তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁর স্কুলে নিয়ে যেতেন। তখনকার সময়ে মেয়েরা অভিভাবক হিসেবে তাদের ছোটভাই জাতীয় বালকদের নিয়ে যেতে পারত।

মেয়েদের স্কুলে অকারণে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার মতো বিরক্তিকর কাজে আমি রাজি হতাম দুটা কারণে। পারুল আপাকে স্কুলে যাবার জন্যে প্রতিদিন আট আনা পয়সা দেয়া হতো। তিনি যেতেন রিকশায় করে, প্রায়ই ফিরতেন হেঁটে। রিকশায় চড়ার আনন্দ এবং বেঁচে যাওয়া পয়সায় নানাবিদ সুখাদ্য কেনার আনন্দেই আমি সঙ্গী হতাম।

শিশুদের জন্যে সুখাদ্যের অভাব সে-সময় ছিল না। তালিকা দেই—

১. হজমি (বেশি পাওয়ারের কিছু হজমি তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে দেয়া হতো। তৈরি প্রক্রিয়ায় আগুন জ্বলত। সেই হজমি খাওয়ার পর দাঁত মুখ সব হতো কালো।)

২. আইসক্রিম (আইসক্রিমওয়ালা দুই হাতে দুটা সিলিন্ডার টাইপ আইসক্রিম ফ্লাস্ক নিয়ে বের হতো। একটায় থাকতো দুধমালাই আইসক্রিম, দাম দুই আনা। অন্যটায় এক আনা দামের সাধারণ। দুটার স্বাদই অপূর্ব। দুধমালাইয়ের স্বাদ অপূর্ব টু দ্য পাওয়ার ফাইভ।)

৩. বুট ভাজা (ঝাল লবণসহ)

৪. বাদাম ভাজা (ঝাল লবণসহ)

৫. গোল্লা লজেন্স (বড় বড় গোল লজেন্স। লাল ডোরাকাটা। খাওয়ার পর পর মুখ টকটকে লাল।)

৬. আচার (আচারওয়ালা মাথায় আচারের খলুই নিয়ে ঘুরতো। অতি সুরেলা গলায় 'মিষ্টি আচার' বলে ডাক দিত।)

পারুল আপার মা অতি ভালো মহিলা ছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের যেমন আদর করতেন অন্যদেরও করতেন। তাঁর মাথায় সামান্য দোষ ছিল। মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই প্রচণ্ড রেগে যেতেন। তখন হাতের কাছে যাকে পেতেন তাকেই মারতেন। আমিও একবার তাঁর হাতে মা'র খেয়েছি। বিভিন্ন পীর-ফকির এসে এই মহিলাকে ঝাড়তো। ফকিরের ঝাড়ার একটা দৃশ্য এখনো মনে আছে। মহিলাকে বসানো হয়েছে ভেতরের উঠোনের এক চৌকিতে। তিনি বিরাট ঘোমটা টেনে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁর সামনে ফকির সাহেব একটা শলার ঝাড়ু হাতে দাঁড়ানো। ফকির সাহেবের মুখভর্তি দাড়ি। কুস্তিগিরের মতো বলশালী শরীর। ফকির সাহেব যখন মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেন তখন পারুলের বাবা তাঁর স্ত্রীর মাথায় এক কলসি পানি ঢালেন। পানি ঢালা শেষ হতেই ফকির সাহেব শলার ঝাড়ু দিয়ে মহিলার পিঠে প্রচণ্ড বাড়ি দেন। মহিলা 'ও আল্লাগো' বলে চাপা চিৎকার করেন। এই হচ্ছে প্রক্রিয়া। চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে কী হয় সেটা আমার দেখা হয় নি। কারণ ফকির সাহেব এক পর্যায়ে 'পুলাপান সরাও' বলে হুঙ্কার দিতেই আমাদের বের করে দেয়া হয়।

আমার প্রতি পারুল আপা তীব্র যে মমতা দেখিয়েছেন তার উৎস ফ্রয়েডীয়। তখন কিছুই বুঝি নি, এখন বুঝতে পারছি। আমি পশ্চিমা দেশের লেখক হলে কী কারণে ফ্রয়েডীয় বলছি ব্যাখ্যা করতাম। বাংলা ভাষার লেখকদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

আমাদের পাড়ায় এক বিহারি পরিবার থাকত। তাদের তিন মেয়ে, তিনটাই পরীর মতো সুন্দর। মেয়ে তিনটা কারো সঙ্গে মিশত না। বাড়ির ভেতর ঘুরঘুর করত। মা'কে কাজে সাহায্য করত। ঐ বাড়িতে আমার খুবই যাতায়াত ছিল। তিন বোনের মধ্যে ছোট দুজনকেই আমি আলাদাভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। যতদূর মনে পড়ে দুজনই মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছে।

বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে আমার মধ্যে লজ্জা কখনো কাজ করে নি। আমি সরাসরি বলেছি, বড় হয়ে আমাকে বিয়ে করবে ?

বিয়ের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহের কারণ মহাজন সাহেবের বাড়ি। আমাদের বাসার কাছেই এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের বিশাল বাড়ি ছিল। সে বাড়িতে কিছুদিন পরপরই বিয়ের অনুষ্ঠান হতো। অতি জাঁকজমকের বিয়ে। পরিবারসুদ্ধ সেই বাড়িতে আমাদের দাওয়াত থাকত। আমি সারাদিনই বিয়ে বাড়িতে পড়ে থাকতাম আর ভাবতাম কবে যে বড় হয়ে বিয়ে করব!

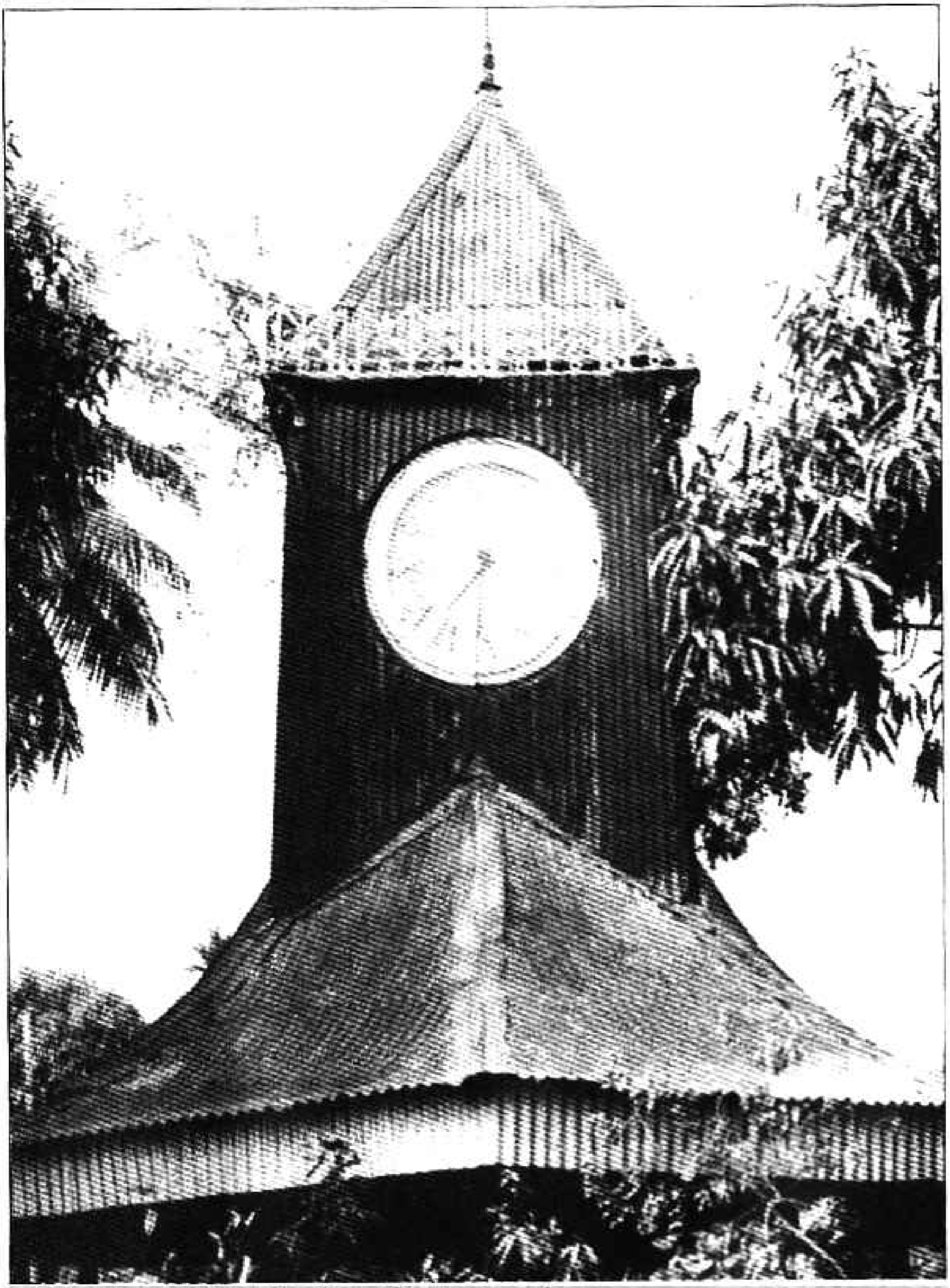

পৃথিবীর সবচে বড় ঘড়ি ? ঐতিহাসিক আলী আমজাদের ঘড়ি

একদিনের কথা মনে আছে। ছুটির দিন, বাবার অফিস নেই, ঘরে বসে বই পড়ছেন। মা বাবার কাছে নালিশ করলেন, তোমার ছেলেকে শক্ত করে একটা চড় দাও।

বাবা বই থেকে মুখ না সরিয়েই বললেন, তার অপরাধটা কী ?

মা বললেন, সে বিয়ে করতে চায়।

বাবা বললেন, বিয়ে করতে চায়, বিয়ে দাও। তার পছন্দের কোনো মেয়ে কি আছে ?

মা কিছু বলার আগেই আমি চিকন গলায় বললাম, আছে। বাবা শব্দ করে হেসে উঠলেন। তিনি মা'কে বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে খুব অল্পবয়সে বিয়ে দেব। আমার চোখের সামনে ছেলে তার বউ নিয়ে রান্নাবাটি খেলবে— এই দৃশ্য দেখব। আমি দুইজনকে দুই কোলে নিয়ে বেড়াতে যাব।

বাবার এটা মুখের কথা ছিল না। তিনি তাঁর কর্মজীবনে যেখানেই কোনো রূপবতী মেয়ে দেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বড়ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেবার কথা ভেবেছেন।

পরম করুণাময় আমার বাবার প্রতি তেমন করুণা করেন নি। তিনি তাঁর কোনো ছেলেমেয়ের বিয়ে দেখে যেতে পারেন নি। অন্য বাড়ির কোনো মেয়ে এসে তাঁকে মিষ্টি গলায় 'বাবা' ডাকে নি। অন্য বাড়ির কোনো ছেলে তাঁর সামনে পুত্রসম এসে দাঁড়াবার সুযোগ পায় নি। আহারে!

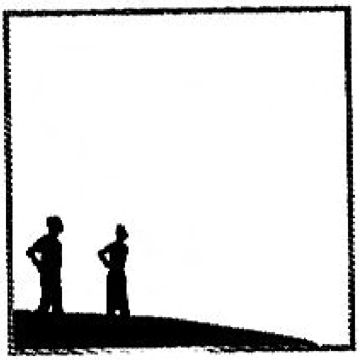

পিতা শৌখিনদার!

নেত্রকোনা এবং সিলেট অঞ্চলে 'শৌখিনদার' শব্দটা প্রচলিত। শৌখিনদার হলো বড়লোক পিতার অলস সন্তান। কাজ নাই, কর্ম নাই, দুশ্চিন্তা নাই। জীবন চর্যা শখ মিটানোতে সীমাবদ্ধ। পায়রা উড়াও, মোরগের লড়াইয়ের ব্যবস্থা করো, বন্দুক হাতে পাখি শিকারে যাও। জীবনের উদ্দেশ্য একটাই— শখ মিটানো।

আমার বাবা ছিলেন দরিদ্র শৌখিনদার। অন্য শৌখিনদারের সঙ্গে তাঁর আরেকটা পার্থক্য ছিল— জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বড় ছিল।

তাঁর ফটোগ্রাফির শখ ছিল। যেখানে যেতেন কোডাক ক্যামেরা সঙ্গে থাকত। বাসার একটা ঘরে ডার্করুম বানিয়ে নিজেই ছবি ডেভেলপ করতেন। আমার জীবনের আনন্দময় স্মৃতির একটি হলো, সব ভাইবোন পানির গামলার চারপাশে গোল হয়ে বসে আছি। গামলায় পোস্টকার্ড সাইজ শাদা কাগজ ছাড়া হয়েছে। আস্তে আস্তে কাগজে রঙ ধরছে। ছবি ভেসে উঠছে। কী দুর্দান্ত ম্যাজিক! বাবা ম্যাজিশিয়ান।

তাঁর বই কেনার শখ ছিল। বড় বড় ট্রাঙ্ক ভর্তি ছিল বইয়ে। প্রতি শীতে একবার সমস্ত বই বের করে রোদে দেওয়া হতো। এই কাজটা করতাম আমরা ভাইবোনরা। বাসার সামনে পাটি পেতে গাদাগাদা করে বই রাখা। রুটি ভাজার মতো বই উল্টে দেয়া। বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে যারা যেত তারাও দৃশ্যটা আগ্রহ নিয়ে দেখত। কেউ কেউ কাছে এসে দাঁড়াত; বিস্মিত গলায় বলত, 'এত বই!' আমার খুব আনন্দ হতো। আমি গম্ভীর গলায় বলতাম, 'আরো আছে। ঘরে রাখা আছে।' এটা মিথ্যা ভাষণ। সব বইই রোদে দেয়া হয়েছে।

তাঁর মহাপুরুষদের ছবি বাঁধিয়ে ঘরে টানিয়ে রাখার শখ ছিল। ঘরভর্তি শুধু ছবি। মাইকেল মধুসূদন যেমন আছেন, জর্জ বার্নাড শ'ও আছেন। কোন ছবিটা কার এটা জানা আমাদের বাধ্যতামূলক ছিল। বার্নাড শ'র ছবি কোনটা তা আমি যেমন জানতাম আমাদের কাজের ছেলে রফিকও জানত।

তাঁর গান-বাজনার শখ ছিল। প্রতি সপ্তাহে বাসায় গানের আসর হতো। গভীর রাত পর্যন্ত গানবাজনা চলত। তিনি নিজে বেহালা বাজানো শিখবেন বলে বেহালা কিনেছেন। ওস্তাদ রেখে বেহালা শেখার সামর্থ্য হয় নি বলে কোনোদিন বেহালা বাজানো হয় নি। দীর্ঘদিন তিনি এই বেহালা যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখলেন।

আমি লেখক জীবনের এক পর্যায়ে হিমু নিয়ে উপন্যাস শুরু করলাম। হিমু'র বাবা ছেলেকে মহাপুরুষ বানানোর চেষ্টা করেন। নানান পরিকল্পনা— কঠিন ট্রেনিং। এই চরিত্রের ধারণা কি আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি ? সম্ভাবনা একেবারেই যে নেই তা-না। বাবা একই কাজ করেছেন। ছেলেমেয়েদের নানান বিষয়ে আগ্রহী করার চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন তিনি ঘোষণা দিলেন, 'সঞ্চয়িতা' থেকে কেউ পুরো একটা কবিতা মুখস্থ শোনাতে পারলে একআনা পয়সা পুরস্কার। আমরা মহাউৎসাহে কবিতা মুখস্থ করতে লেগে গেলাম।

ছবি আঁকার দিকে আমাদের সবার প্রবল ঝোঁক। বাবা ঘোষণা করলেন, ছবির অ্যাক্সিবিশন হবে, সবাই ছবি এঁকে জমা দাও। ফার্স্ট প্রাইজ দুই আনা, সেকেন্ড প্রাইজ এক আনা। আমরা মহাউৎসাহে ছবি আঁকায় লেগে গেলাম।

আমার গল্পের বই পড়ার তীব্র নেশা। একদিন আমাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সদস্য করে দিলেন। সপ্তাহে দুটা করে বই আনা যাবে। আমি তখন ক্লাস টুতে পড়ি। আমার ধারণা কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের আমিই সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

লেখালেখিতে উৎসাহী করার জন্যে প্রতি বছরই তিনি তাঁর সব ছেলেমেয়েকে একটা করে ডায়েরি দিতেন। আমাদের দায়িত্ব ছিল, ডায়েরি ভর্তি করে গল্প-কবিতা লিখতে হবে।

একটা ঘটনা বলি। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই আহসান হাবীব তার ডায়েরিতে একটা কবিতা লিখে বাবার কাছে জমা দিল। কবিতার শিরোনাম— 'জিনিশ তুলিবে'।

জিনিশ তুলিবে
জিনিশ পাইলে তুলিবে
তুলিবে তুলিবে তুলিবে
যদি না তুলিবে তবে পরে হইবে দরকার।

বাবা বললেন, কবিতা তো অতি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, কিন্তু বাবা এর অর্থ কী ?

আহসাব হাবীব বলল, সে নানান সময় দেখেছে মূল্যবান জিনিস বারান্দায়, ঘরের কোনায় পড়ে থাকে, কেউ তুলে গুছিয়ে রাখে না। পরে যখন দরকার হয় তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে কবিতা।

বাবা বললেন, অসাধারণ। উপদেশমূলক সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। আরো লেখ।

বাবার একটি বিচিত্র অভ্যাসের কথা বলি। তিনি ছেলেমেয়েদের নাম বদলাতে পছন্দ করতেন। হঠাৎ একদিন ঘোষণা করবেন, আজ থেকে তোমার এই নাম।

আমার শুরুর নাম ছিল শামসুর রহমান। ফয়জুর রহমানের সঙ্গে মিলিয়ে শামসুর রহমান। হঠাৎ একদিন হয়ে গেল হুমায়ূন আহমেদ। জাফর ইকবালের ডাক নাম ছিল বাবলু কিংবা বাবুল। ছোটবোনের নাম প্রথমে ছিল শেফালি, পরে হয়ে গেল সুফিয়া। আহসান হাবীবের নাম ছিল কুদরতে খুদা।

তবে আহসান হাবীবের নাম বাবা বদলান নি, আমি বদলেছি। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি। থাকি বগুড়ায়। একদিন বাবাকে ভয়ে ভয়ে বললাম, কুদরতে খুদা নামটা আমার পছন্দ না।

বাবা বললেন, কেন পছন্দ না ? কুদরতে খুদা আমাদের দেশের এত বড় একজন সায়েন্টিস্ট।

আমি বললাম, তারপরেও পছন্দ না। সে যখন বড় হবে তখন তার এই নাম নিয়ে মন খারাপ করবে।

ঠিক আছে তুই তার একটা নাম দে, যে নাম বড় হয়ে সে অপছন্দ করবে না।

আমি নাম দিলাম আহসান হাবীব। কবি আহসান হাবীব সাহেবের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই নাম না। আমাদের ক্লাসে আহসান হাবীব নামের ব্রিলিয়ান্ট এক ছাত্র ছিল। তার সঙ্গে মিলিয়ে রাখা নাম।

আমার ধারণা বাবা আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে আমাদের সবার নাম আরেক দফা পাল্টাতেন।

বাবার কাছ থেকে জেনেটিক্যালি আমি যা পেয়েছি তা হলো মুগ্ধ হবার ক্ষমতা। তিনি অতি তুচ্ছ জিনিসে মুগ্ধ হতেন। তাঁর চোখে পানি চলে আসত। আমিও অতি তুচ্ছ জিনিসে মুগ্ধ হই। বাবার মুগ্ধতার একটা নমুনা দেই। আমরা তখন পিরোজপুরে। জাফর ইকবাল বারান্দায় বসে আছে। রাত। বারান্দায় হাত-

মুখ ধুয়ে সে ঘুমাতে যাবে। হঠাৎ সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে বসল, 'কত তারা আকাশে!'

বাবা মোহিত। কী সুন্দর একটা বাক্য— কত তারা আকাশে। তিনি মুগ্ধতা ধরে রাখতে পারলেন না— একটা নাটক লিখে ফেললেন। নাটকের নাম— কত তারা আকাশে।

পুলিশের জটিল চাকরিতে কোনো ছুটিছাটা নেই। রাত দশটা-এগারোটার আগে কোনোদিনই বাসায় ফিরতেন না। এর মধ্যেও লেখালেখির সময় বের করতেন। অনেকবার গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি, তিনি বুকের নিচে বালিশ রেখে নিবিষ্ট মনে লিখছেন।

আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়। গল্প সংকলন। নাম 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'। সস্তা নিউজপ্রিন্টে ছাপা। কভারে একটি মেয়ের ছবি, সেই ছবি আমার আঁকা। অতি অখাদ্য এক প্রেস থেকে বাবা নিজেই বইটি ছাপিয়েছেন। বইটি কিছুটা দৃষ্টিনন্দন করা যায় কি-না সেই চেষ্টায় তিনি লাল রঙ কিনে আনলেন। পিতা-পুত্র মিলে বইয়ের চারদিক লাল রঙ করলাম। বইটির চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেল। বাবা তাতেও মুগ্ধ। বাহ, ভালো হয়েছে তো!

পাঠক মাত্রই জানতে চাইবেন গল্পগুলি কেমন ? পুরনো ধারার লেখকদের গল্পের মতো গল্প। প্রচুর আবেগ। ফ্লাওয়ারী ভাষা। চরিত্র চিত্রনের চেয়ে ভাষার

পড়াশোনা নামক কষ্টকর অধ্যায়ের শুরু কিশোরী মোহন পাঠশালায়। এটি এখন কিশোরী মোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খেলা প্রধান। অপ্রধান বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া। এই মুহূর্তে একটি গল্প মনে পড়ছে। একটা কাজের ছেলের বসন্ত রোগ হয়েছে। সে বলছে— 'বড় কুলচায়'। সে বলতে চাচ্ছে— 'বড় চুলকায়', সে তার সাহেবকে এরকম বলতে শুনেছে। এখন গুবলেট করে ফেলেছে। এখন বলছে— 'কুলচায়'। বিষয়টা নিয়ে গল্প লেখা চলে না, প্রসঙ্গক্রমে আসলে আসতে পারে।

বাবার জীবনে প্রকাশিত একমাত্র বইটির কোনো কপি আমাদের কারোর কাছেই নেই। থাকলে আরেকবার পড়তাম।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী' প্রকাশ করা নিয়ে অনেককাল পরে আমি নিজে একটি গল্প লিখি। গল্পটির নাম 'আনন্দ বেদনার কাব্য'। গল্পটি দিয়ে দিচ্ছি। গল্প পড়লেই আমার বাবাকে কিছুটা চেনা যাবে।

আনন্দ বেদনার কাব্য

বইটির নাম 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'।

প্রচ্ছদে একটি মেয়ের মুখের ছবি। মেয়েটি কাঁদছে। তার মুখের পাশে একটি গ্লোব। একটি বিকটদর্শন নর-কঙ্কাল গ্লোবটি বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। কঙ্কালটির ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যথেষ্ট জটিলতা। পৃথিবীর রিক্তশ্রী ফুটিয়ে তোলার আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই। এ ধরনের প্রচ্ছদচিত্রের বইগুলোর পাতা সাধারণত উল্টানো হয় না। তবুও অভ্যাসবশেই পাতা উল্টালাম। এবং একসময় দেখি গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বোধহয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কন করে। অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায়, আমার বেনু মা দেখিতে পাইল না।'

বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদশিল্পীর সামান্য একটু পরিচয়ও আছে।

সেখানে লেখা— প্রচ্ছদশিল্পী : মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম। দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাৎ করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি ঘিরে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের

সামনে দেখতে পেলাম। লম্বা বেণির দশম শ্রেণীর কালোমতো রোগা একটি মেয়ে যেন গভীর ভালোবাসায় বাবার বইয়ের জন্যে রাত জেগে প্রচ্ছদ আঁকছে। আঁকা হবার পর বাবাকে দেখাল সেটি। পৃথিবীর সব বাবাদের মতো এই বাবাও মেয়ের শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতে সবাই খেতে বসেছে। দরিদ্র আয়োজন। কিন্তু সবার মুখ হাসি-হাসি। বাবা বললেন, পাস করলে আমার বেনু-মাকে আমি আর্ট কলেজে দেবো। বেনু বেচারি লজ্জায় মরে যায়। ভাত মাখতে মাখতে বলল, দূর ছাই, মোটেও ভালো হয় নি। বাবা রেগে গেলেন, ভালো হয় নি মানে ? আঁকুক দেখি কেউ এরকম একটা ছবি।

বই অবশ্যি বাবা প্রকাশ করতে পারলেন না। কে ছাপবে এরকম বই ? দু'একজন প্রকাশক বলেও ফেলল, এসব পদ্যের বই কি আজকাল চলেরে ভাই ? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। টাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপান।

প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে বাবার দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগল। হয়তো স্ত্রীর কানের দুলজোড়া বিক্রি করতে হলো। সে বছর ঈদে বাচ্চারা কেউ কাপড় নিল না। তিনি খুঁজে পেতে সস্তার একটি প্রেস বের করলেন, যার বেশির ভাগ টাইপই ভাঙা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ প্রেসের মালিক সালাম সাহেব, গ্রন্থকারের কবিতার একজন ভক্ত। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'টাউন প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল সালাম সাহেব আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এই কাব্যানুরাগী বন্ধুবৎসল মানুষটির সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। জনাব আবদুস সালাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নাই।'

ভূমিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি সন্ধ্যাবেলায় প্রুফ দেখতে যখন যেতেন তখন সালাম সাহেব হাসিমুখে বলতেন, এই যে কবি সাহেব, আসেন, আপনার সেকেন্ড প্রুফ রেডি। কই রে কবি সাহেবের জন্যে চা আন। চা খেতে খেতে বললেন, প্রুফে চোখ বুলাতে বুলাতে আপনার একটা কবিতা পড়েই ফেললাম। বেশ লিখেছেন।

কোন কবিতাটির কথা বলছেন ?

ঐ যে কী যেন বলে, ইয়ের উপর যেটা লিখলেন। বৃষ্টি বাদলার কথা আছে যেটায়।

ও, 'নব-বর্ষা'র কথা বলছেন ?

হ্যাঁ, ঐটাই। চমৎকার। খুবই ভাবের কথা। আপনি তো ভাই বিরাট লোক।

কবি নিশ্চয়ই বই ছাপানোর সব টাকা আবদুস সালাম সাহেবকে দিতে পারেন নি। সালাম সাহেব বললেন, যখন পারেন দিবেন। কবি মানুষ আপনি।

আপনার কাছে টাকা মার যাবে নাকি— হা হা হা। ক'জন পারে আপনার মতো কবিতা লিখতে ?

ভূমিকা পড়েই জানতে পারলাম নেত্রকোনা শহরের একজন প্রবীণ উকিল বাবু নলিনী রঞ্জন সাহাও জনাব আবদুস সালামের মতো কবির প্রতিভায় মুগ্ধ। কবি লিখেছেন, 'বাবু নলিনী রঞ্জন সাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহী করিয়াছে। বাবু নলিনী রঞ্জন একজন স্বভাব-কবি এবং কাব্যের একজন কঠিন সমালোচক। তিনি যখন আমার কবিতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মঞ্জুষা'তে আমার একটি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কবির কাব্যগ্রন্থ অনতিবিলম্বে প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তখনই আমি স্থির করি...।'

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'তে মোট একশ' তেরোটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট। কয়েকটি উল্লেখ করি। 'দিবাবসান' কবিতাটির ফুটনোটে লেখা, 'আমার বড় শ্যালক জনাব আমীর সাহেবের বাড়িতে এই কবিতাটি রচিত হয়। তাহার বাড়ির সন্নিকটে খরস্রোতা একটি নদী আছে (নাম স্মরণ নাই)। উক্ত নদীর তীরে এক সন্ধ্যায় বসিয়াছিলাম। দিবাবসানের পরপরই আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। কবিতা রচনার উপকরণ সঙ্গে না থাকায় আবেগটি যথাযথ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সমস্ত কবিতাটি মনে মনে রচিত করিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে।'

অন্য একটি কবিতার (বাসর শয্যা) ফুটনোটটি এরকম— 'এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসর রাত্রে রচনা করিয়াছি। সেই সময় বাহিরে খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমার নবপরিণীতা বালিকাবধূ মেঘগর্জনে বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল।'

বাসর রাত্রিতে স্বামীর এই কাব্যরোগ দেখে নতুন বৌটি নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়েছিল। তার চোখে ছিল বিস্ময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়। কবি স্বামী দীর্ঘ রচনাটি কি সেই রাত্রেই পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে ? না শুনিয়ে কি পারেন ? ঝড় জলের রাত। হাওয়ার মাতামাতি। টাটকা নতুন কবিতা। রহস্যমণ্ডিত এক নারী। সেই রাত কী যে অপূর্ব ছিল সেটি আমরা ফুটনোট পড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

এবং এও বুঝতে পারি, যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছ'পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখতে পারেন, তিনি পরবর্তী সময়ে কী পরিমাণ বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীর মনে। ঘরে হয়তো টাকা-পয়সা নেই। ছোট ছেলের জ্বর।

তার জন্যে সাগু কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। গভীর ভাবাবেগে তাঁর চোখে জল। লিখছেন 'একদা জ্যোৎস্নায়' নামের দীর্ঘ কোনো রচনা। কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয় ? দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বঞ্চনা কিছুই তাঁদের স্পর্শ করে না। স্বর্গীয় কোনো একটি হিংস্র পশু তাঁদের তাড়া করে ফিরে। কেন করে ? আমার উত্তর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়।

এইসব নিশি-পাওয়া মানুষদের বেশিরভাগই নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং কয়েকজন ভালোমানুষ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কারো কাছে তাঁদের আবেগের কথা পৌছাতে পারেন না। কৃপণ ঈশ্বর এদেরকে আবেগে উদ্বেলিত হবার মতো অপূর্ব একটি হৃদয় দিয়ে পাঠান, কিন্তু সেই আবেগকে প্রবাহিত করবার মতো ক্ষমতা দেন না। এরা বড় দুঃখী মানুষ।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার এমন কষ্ট হলো। কবি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কত আজেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কী আছে এই স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হলো ? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কবি কিন্তু সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেন নি। [সমুদ্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে বহুবার আমি মনশ্চক্ষে সমুদ্র দেখিয়াছি। ফুটনোট, 'হে মহাসিন্ধু'।]

কবিতা আমি পড়ি না। কিন্তু 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র প্রতিটি কবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিছুই নেই। কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিশ্চয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অবিক্রিত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাণে ধরে সের দরে বিক্রি করতে পারবে না। বইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী মাঝে মাঝে গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তাতে কী আছে ? অন্তত একটি দিনের জন্যে হলেও তো এই পরিবারটিতে আনন্দ এসেছিল। কবি-স্ত্রী মুগ্ধচোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, আমার স্বামী তাহলে সত্যি সত্যি একটি বই লিখে ফেলেছেন ? ছেলেমেয়েরা বাবার বই নিয়ে ছুটে গেছে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে।

বাবা প্রথমবারের মতো বুক উঁচু করে তাঁর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেছেন, স্যার, আপনার জন্যে একটা বই আনলাম। বড় সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি আবার বই লিখলেন কবে ?

স্যার, প্রচ্ছদটা আমার মেয়ের আঁকা।

তাই নাকি ? বাহ্ চমৎকার!

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি। শেষ কবিতাটির নাম— 'মাগো'। কবিতাটি নূরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ 'উপশম' দেবার জন্যে। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে উঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে।

একটিমাত্র কবিতা লিখেও কেউ কেউ কবি হতে পারেন। অল্প কিছু পঙ্‌ক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক মহান বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সেই অর্থে আমাদের 'রিক্তশ্রী'র কবি একজন কবি।

আমার বাবা বড় মাপের শিক্ষক ছিলেন। কাউকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে তিনি আমাদের জীবনের গভীরতম বোধের শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন। জীবনের জটিলতা আমরা তাঁর কাছে শিখি নি। শিখেছি জীবনের সারল্য। এই শিক্ষা কঠিন শিক্ষা।

বাবার মৃত্যুর পর তাঁর এক কলিগ আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাবর রোডের বাসায় এলেন। আগমনের উদ্দেশ্য সমবেদনা জানানো। তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে বললেন, বাবা ফুল তো চেন। চেন না? ফুল, পুষ্প। যে-কোনো ফুল।

আমি চুপ করে রইলাম।

তিনি বললেন, তোমার বাবা ছিলেন খুব সুন্দর একটা ফুল। এই কথাটা সারাজীবন মনে রাখবে। আর কিছু মনে রাখার প্রয়োজন নাই।

মা আবেগে অভিভূত হয়ে বললেন, আপনি উনার জন্যে দোয়া করবেন।

ভদ্রলোক বললেন, ফয়জুর রহমানের জন্যে কারো দোয়ারই প্রয়োজন নাই।

শুরুতে একবার লিখেছিলাম, পরম করুণাময় আমার বাবার প্রতি তেমন করুণা করেন নি। এখন মনে হচ্ছে ভুল লিখেছি, পরম করুণাময় বিশেষ করুণা করেছেন বলেই না তাকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেউ একজন বলতে পারে— ফয়জুর রহমানের জন্যে কারো দোয়ার প্রয়োজন নাই।

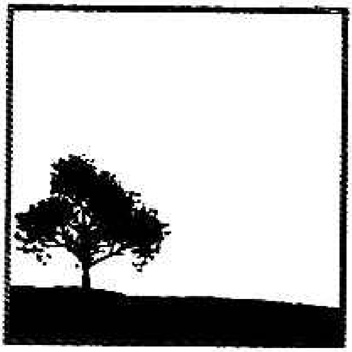

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন-তারিখ বলতে পারব না, শৈশবে বড় ধরনের একটি নির্বাচনের স্মৃতি মনে আছে। মনে হয় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। মিছিল স্লোগানে উত্তেজিত মীরাবাজার। আমি বিশেষভাবে উত্তেজিত সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। নির্বাচন উপলক্ষে মীরাবাজারের দোকানঘরগুলির একটি যুক্তফ্রন্টের অফিস। অফিস ভর্তি নির্বাচনী কার্টুন। যিনি কার্টুন আঁকেন তাঁর চেহারা অবিকল রবীন্দ্রনাথের মতো। আমার প্রধান কাজ অফিসের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করা। লোকজন কম থাকলে অফিসে ঢুকে পড়া। নতুন কী কার্টুন আঁকা হলো সেসব দেখা। এবং কার্টুন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ধমক খাওয়া। উনি আমাকে দেখলেই রেগে গিয়ে বলতেন, যা বললাম, থাপ্পড় খাবি।

কার্টুন শিল্পী আমাকে ধমকাতে ধমকাতে একসময় বিরক্ত হয়েই ধমক দেয়া বন্ধ করলেন। আমি অফিসে ঘুরঘুর করলেও কিছু বলেন না। তাঁর ঘাড়ের উপর উঁকি দিয়ে ছবি আঁকা দেখলেও কিছু বলেন না। বড়ই আশ্চর্যের কথা, ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কথাও বলেন।

খোকা, বড় হলে কী হবে?

ব্যারিস্টার। (ব্যারিস্টার হবার কোনো ইচ্ছা কখনোই আমার ছিল না। ব্যারিস্টার জিনিসটা কী তাও জানতাম না। বড় হয়ে আমার আইসক্রিমওয়ালা হবার ইচ্ছা। সবাইকে তাই বলতাম। ব্যারিস্টারের বিষয়টা বড়মামা আমার মাথায় ঢুকিয়েছেন। বলে দিয়েছেন বড় হয়ে কী হবে? —কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে ব্যারিস্টার হব কিংবা এরোপ্লেন পাইলট হব। কখনো বলবে না— আইসক্রিমওয়ালা হব। আমি বড়মামার কথা মতো কখনো বলি ব্যারিস্টার কখনো বা এরোপ্লেন পাইলট।)

ছবি আঁকতে পার?

না।

শিখবে ?

হুঁ।

আচ্ছা ঠিক আছে। ব্যবস্থা হবে।

একদিন ব্যবস্থা হলো। তিনি নীল একটা পেন্সিল আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ছবি আঁক। আমাদের সময় লাল নীল পেন্সিল বলে একটা জিনিস ছিল। মোটা পেন্সিল, অর্ধেকটার গাঢ় লাল শিষ বাকি অর্ধেক গাঢ় নীল।

বড় একটা গোল্লা আঁক।

আমি আঁকলাম।

গোল্লার ভেতর দু'টা ছোট গোল্লা আঁক।

ছোট গোল্লা আঁকলাম।

এখন দুই ছোট গোল্লার ভেতর দুটা ফোটা দাও। তারপর দেখ কী হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম একটা বালকের মুখ আঁকা হয়েছে যে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

কার্টুনিস্ট আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দ্রুত কয়েকটা টান দিলেন। বালকের মুখ হয়ে গেল বিড়ালের মুখ। বিড়ালটা লেজ উঁচু করে বসে আছে।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ কী করে সম্ভব ? তিনি লাল নীল পেন্সিলটা আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি আনন্দে অভিভূত হলাম। অনেক অনেক দিন এই পেন্সিল আমার পকেটে পকেটে ঘুরেছে। তবে ছবি আঁকা তেমন হয় নি। কারণ ছবি আঁকার কাগজ নেই। বাবার একটা বড় খাতা ছিল— জন্মবৃত্তান্ত খাতা, যেখানে তাঁর ছেলেমেয়েদের সঠিক জন্মক্ষণ, রাশিফল ইত্যাদি লেখা থাকত। ঐ খাতার সাদা পাতা চুরি করে কিছু ছবি আঁকা হতো। ব্যাপারটা একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়ার পর বাবা দয়াপরবশ হয়ে ছবি আঁকার কাগজ কেনার একটা বাজেট করে দেন। তারো বেশ কয়েক বছর পর তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী করেন। আমাদের বাসার বারান্দায় সব ছবি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তিনি গম্ভীর ভঙ্গিতে প্রতিটি ছবি দেখেন এবং একটি ছবিকে প্রথম ঘোষণা করেন। ছবিটা জাফর ইকবালের আঁকা সাইকেলের ছবি। সাইকেলের সামনের চাকাটা বড়, পেছনেরটা বেশ ছোট। দু'টা চাকা দু'রকম কেন ?— জিজ্ঞেস করায় সে উত্তর

দেয়— সামনের চাকাটা কাছে বলে বড়। পিছনেরটা দূরে, তাই ছোট।

বাবা তার শিশুপুত্রের কাছে এমন জবাব পাবেন কল্পনাও করেন নি। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তার পুত্র-কন্যাদের প্রতিভা বিষয়ক মুগ্ধতা আমৃত্যু লালন করেছেন।

কার্টুনিস্টের কাছে ফিরে যাই। উনার সঙ্গে আমার এক ধরনের অসম বন্ধুত্ব হলো। আমার বসার জন্যে তিনি একটা উঁচু টুলের ব্যবস্থা করলেন। কাজের ফাঁকে দিনে কয়েকবার তিনি চা এবং টোস্ট বিসকিট খেতেন। টোস্ট ভেঙে অর্ধেকটা আমার হাতে দিতেন। তিনি যখন চা খেতেন পিরিচে করে তার খানিকটা আমাকে দিতেন। তাঁর চায়ের কাপে টোস্ট ভিজিয়ে তিনি খেতেন, আমিও খেতাম। আমার জন্যে মোটামুটি আনন্দময় সময়। হঠাৎ হঠাৎ আমার চেহারা নিয়ে দ্রুত কার্টুন এঁকে আমার কাছে দিতেন। আমি মুগ্ধ হয়ে নিজের ছবি দেখতাম।

ছবি আঁকার সময় তার দুই হাত বন্ধ থাকত তখন পাঞ্জাবির পকেট থেকে আমাকেই সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই বের করে দিতে হতো। একবার পকেট থেকে সিগারেট বের করছি, উনি বললেন, পকেটে আর কিছু আছে? আমি বললাম, একটা সিকি আছে।

তিনি বললেন, সিকিটা তুই নিয়ে যা। এরপর থেকে পকেটে হাত দিলে পয়সা পেলে তুই নিয়ে যাবি, আমাকে কিছু বলতে হবে না।

একদিন আনন্দের সমাপ্তি ঘটল। খারাপভাবেই ঘটল ঘটনাটা। কার্টুনিস্ট ছবি আঁকছেন। আমি তাঁর ঘাড়ের উপর মাথা বের করে গভীর আগ্রহে দেখছি। আমার স্কুল বন্ধ। সকাল থেকেই আছি। আর্টিস্টের জন্যে চা এবং টোস্ট বিস্কিট এসেছে। টোস্ট বিস্কিটের অর্ধেকটা ভেঙে কখন আমার হাতে দেয়া হবে তার জন্যে আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষা। এই সময় এক লোক অফিসে ঢুকল। ধাক্কা দিয়ে সে আর্টিস্টকে ফেলে তার গলা পা দিয়ে চেপে ধরল। অফিসে যে দুজন ছিল তারা ছুটে এলো। এবং তারাও আর্টিস্টের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভেতর থেকে চিৎকার আসছে— 'মেরে ফেল। কুত্তাটারে মেরে ফেল।' অফিসের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো। বন্ধ অফিসের ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ আসছে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছি।

কার্টুনিস্টের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। অফিসের বন্ধ দরজা এরপর আর খুলে নি। মানুষটার কী হলো? অফিসটার কী হলো? —কিছুই জানি না।

কতবার যে অফিসের বন্ধ দরজার সামনে গিয়েছি। একে ওকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ কিছু বলে না। ক্লাস টুতে পড়া একটি শিশুর প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বড়রা মনে করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দেখতে এই মানুষটাকে নিয়ে আমি শিশু-কিশোরদের জন্যে একটা উপন্যাস একসময় লিখি। উপন্যাসটির নাম 'বোতলভূত'।

লেখক হবার একটা সুবিধা আছে। একজন লেখক কাউকেই হারিয়ে যেতে দেন না।

প্রসঙ্গ 'মা'

শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে তার মা যে বদলাতে থাকে— এই তথ্য কি কোনো শিশু জানে ? শিশুর বয়স যখন দুই তখন তার মা এবং শিশুর বয়স যখন আট তখনকার মা দুই মানুষ।

অতি শৈশবের মা'কে আমার মনে নেই। যে মা'কে মনে আছে তাঁর বয়স আঠারো-উনিশ। ঝলমলে তরুণী। যে তাঁর বিশাল সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। বিশাল সংসার, কারণ স্বামী-পুত্র-কন্যা ছাড়াও সংসারে বাড়তি দু'জন— একজন দেবর, আরেকজন তাঁর ছোটভাই। এই দুজনের প্রধান কাজ সারাদিন খটাস খটাস শব্দে ক্যারাম খেলা এবং প্রতিবছর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা। রেজাল্ট আউট হওয়ার পরের কয়েকদিন ক্যারাম খেলা বন্ধ থাকে, আবার শুরু হয় খটাস খটাস।

আঠারো-উনিশ বছরের একজন তরুণীর চোখে নানান স্বপ্ন থাকে। আমার মায়েরও নিশ্চয়ই ছিল। স্বপ্নকে প্রবাহিত করার কোনো সুযোগ কি ছিল ? আমার মনে হয় না। মহিলার স্বামী মানুষ হিসেবে ইন্টারেস্টিং। ভাবুক, প্রেমিক, জটিলতামুক্ত প্রায় মহাপুরুষ পর্যায়ের একজন। মহাপুরুষ দিয়ে সংসার চলে না। সংসারের চালিকাশক্তি অর্থ। মহাপুরুষের অর্থ ছিল না। তাঁর বেতন ছিল সর্বসাকুল্যে আশি টাকা। এই টাকার একটি অংশ চলে যেত দেশের বাড়িতে। একটি অংশ বই কেনায়, ক্যামেরার ফিল্ম কেনায়, একটি অংশ গান-বাজনার আসরে বন্ধুদের পেছনে। বাকি যা থাকত তা তিনি স্ত্রীর হাতে দিয়ে মধুর হাসি হেসে বলতেন, কষ্ট করে চালিয়ে নাও। মা চোখের পানি ফেলতেন।

পুলিশের চাকরির কারণে বাবা রেশন পেতেন। ভাত-ডালের ব্যবস্থা হতো। বাকি খরচ কোত্থেকে আসবে! পুলিশের রেশনে কাপড় দেয় না। মা'কে তাকিয়ে থাকতে হতো তাঁর বাবার দিকে। উনি প্রায়ই কন্যার শাড়ি কিনে পাঠাতেন।

স্বামী-স্ত্রীর নিখাদ ভালোবাসায় সংসার অতি সুখের হয় এই ধারণা ভুল। সংসার সুখের হতে হলে কিছু অর্থের অবশ্যই প্রয়োজন হয়।

আমার মায়ের নিশ্চয়ই ইচ্ছা করত ভালো কোনো খাবার তাঁর স্বামী-পুত্র-কন্যাদের পাতে তুলে দিতে। তিনি কখনোই তা পারেন নি। মা'র কাছ থেকে শোনা আমাদের বাসার মেনু ছিল—

নাশতা : রুটি, পেঁপে ভাজি (আটা পুলিশের রেশনের)।

লাঞ্চ : ভাত, ডাল, ডালের বড়া (ডালের বড়া বানানোর তেল পুলিশের রেশনের)।

ডিনার : ভাত, ডাল, নিমপাতা ভাজি (বাসার পেছনে বড় নিম গাছ ছিল। আমরা সেই নিম গাছের সব পাতা ভেজে খেয়ে ফেলেছি।)

সমস্যার এখানেই শেষ না, বাবার নিয়ম ছিল কোনো ভিখিরি এসে যদি ভাত চায় তাকে ভাত খেতে দিতে হবে। ভিখিরিরাও এই খবর পেয়ে গিয়েছিল। প্রতি দুপুরেই তারা নিয়ম করে এসে কুয়াতলায় বসে পরম তৃপ্তিতে ভাত খেত। ভিখিরিদের খাওয়া দেখাটা আমার জন্যে খুব আনন্দের ছিল। কী তৃপ্তি করেই না তারা প্লেট চেটেপুটে খেত! দেখে মনে হতো অমৃতসম কোনো খাদ্য খাচ্ছে।

একদিন আমি মা'কে বললাম, আমিও ভিখিরিদের মতো কুয়ার পাড়ে বসে টিনের থালায় ভাত খাব।

মা চড় দিয়ে বললেন, কী জন্যে ?

কুয়ার পাড়ে বসে ভাত খেতে খুবই মজা।

মা তার ছেলের অধঃপতন দেখে রাগে-দুঃখে কেঁদেকেটে অস্থির হলেন। সব ঘটনা শোনার পর বাবা নির্দেশ দিলেন— ছেলেকে দুপুরে কুয়ার পাড়েই ভাত দেয়া হবে।

আমি তিন-চারবেলা খেয়েছি। আমি এবং আমার ছোটবোন শেফু। দাদাভাই যা করে শেফুর তাই করা চাই। কুয়ার পাড়ে স্বাদের কোনো উনিশ-বিশ না দেখে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া হয়।

মা'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সংসারের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ একজন তরুণী। ছেলেমেয়েগুলি প্রচণ্ড দুষ্ট। কেউ ঘরে থাকে না। ঘরে অভাব। তরুণীর দিশাহারা হবারই কথা। সেই বয়সের একটি মেয়ের কোনো শখই পূর্ণ হবার না। হঠাৎ হঠাৎ ছবিঘরে ছবি দেখতে যাওয়া। এ-পাড়া ও-পাড়ায় বেড়ানো। তিনি কখনো

তাঁর মেয়েকে নিয়ে কখনোবা আমাকে নিয়ে নিজের আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে নিতান্তই অপরিচিত বাড়িতেও ঢুকে যেতেন।

একবার বাবা খুব রাগ করলেন, কারণ মা ডিসট্রিক্ট জজ সাহেবের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। গল্পগুজব করে এসেছেন। বাবা বললেন, আয়েশা শোন, আমি নিতান্তই সাধারণ এক পুলিশের দারোগা। জজ সাহেব কত উপরের একজন মানুষ। তুমি কী মনে করে তাঁর বাড়িতে গেলে ?

মা বললেন, অসুবিধা কী ? আমার স্বামী সাধারণ একজন দারোগা, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা একদিন অবশ্যই জজ-ব্যারিস্টার হবে। আমি জজ-ব্যারিস্টারের মা হিসেবে ঐ বাড়িতে গিয়েছি।

বাবা হেসে দিয়ে বললেন, তোমার যুক্তি মানলাম। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাবে।

অভাব-অনটন একেকজনের উপর একেকভাবে ক্রিয়া করে। অভাব-অনটন মা'কে যুক্তিবাদী করল। মা'র কাছ থেকে আমি শিখেছি লজিক। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, লজিকে কেউ তাঁকে হারাতে পারবে না। তবে আমি কয়েকবার হারিয়েছি। মা নিশ্চয়ই পুত্রের কাছে লজিকে পরাজিত হয়ে খুশি হয়েছেন। কারণ ছাত্র এবং পুত্র এই দুইয়ের কাছে পরাজয়ে আনন্দ আছে। এই দুইয়ের বাইরে কারো কাছে পরাজিত হওয়া দুঃখের এবং কষ্টের ব্যাপার।

মা'কে লজিকে হারানোর গল্পটা বলি। আমি দীর্ঘদিনের সংসার ভেঙে অভিনেত্রী শাওনকে বিয়ে করলাম। মা চিন্তাই করতে পারেন নি তাঁর কোনো ছেলে এমন কাণ্ড করবে। তিনি তাঁর ছেলেকে ত্যাগ করলেন। আমার সব ভাইবোনরাও একই কাজ করল। তাদের যুক্তি— আমি পরিবারকে ছোট করেছি, তাদেরকেও ছোট করেছি। আমার কর্মকাণ্ডে আমার ভাইবোনরা কেন ছোট হবে আমি বুঝতে পারি না। সবাই তার নিজের কর্মের জন্যে দায়ী। একজনের কর্মের দায়িত্ব অন্যজনের না।

ভাইবোনদের সঙ্গে আমি কোনো যুক্তিতে গেলাম না। অতি যুক্তিবাদী মহিলা মা'র কাছে গেলাম। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আমি কখনো কোনোদিনও তোর বাসায় যাব না।

আমি বললাম, যুক্তিতে আসুন। কোন যুক্তিতে আমার বাসায় আসবেন না সেটা বলুন আমি শুনি।

মা যুক্তি দিলেন। আমি পাল্টা যুক্তি দিলাম। মা'কে বলতে হলো— তোর যুক্তি মানলাম। কিন্তু আমি যাব না।

মা অবশ্যি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেন নি। শাওনের চরম দুঃসময়ে তিনি হাসপাতালে ছুটে এলেন। শাওনের তখন খুবই খারাপ অবস্থা। তার পেটের সন্তান সাত মাসে মারা গিয়েছে। সে কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলছে, আমার লীলাবতী! লীলাবতী! সন্তানটির নাম রাখা হয়েছিল 'লীলাবতী'। লীলাবতীর জন্যে সে কত কিছুই না কিনেছিল!

আমি অল্পতেই ভেঙে পড়ি। মা পাশে এসে দাঁড়াতেই অনেক সাহস পেলাম। হঠাৎ মনে হলো, আমি তো একা না। আমার মা আমার পাশে আছেন। এবং অবশ্যই আমার মৃত বাবাও হাসপাতালের এই ঘরেই আছেন। গভীর বেদনায় বলছেন, 'বাচ্চুনি বড় বেটা হুমায়ূনের পাশে কেউ নেই কেন ? কেন আমার ছেলে একা একা কাঁদবে ? আমি কি এই শিক্ষাই আমার ছেলেমেয়েদের দিয়েছি!'

বাবা তাঁর সব ছেলেমেয়েকে নাম ধরে ডাকতেন— শেফু, ইকবাল, শাহীন; শুধু তাঁর বড়ছেলের জন্যে আলাদা নাম এবং বিরাট নাম— বাচ্চুনি বড় ব্যাটা হুমায়ূন।

আমার এবং শাওনের দুঃসময়ে দেশের এবং দেশের মানুষের যে সমবেদনা পেয়েছি তার কোনো তুলনা নেই। আমি ধন্য। শাওন ধন্য। আমার ভাইবোনরা কেউ সামান্য একটা টেলিফোনও করল না— এই দুঃখবোধ আমৃত্যু আমার সঙ্গে থাকবে।

পরকালে আমার কন্যা লীলাবতী যখন তার চাচা এবং ফুপুদের জিজ্ঞেস করবে, 'আমার বাবা যখন ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে একা একা কাঁদছিল, তখন তোমরা তাঁকে একটা সান্ত্বনার কথা কেন বলো নি ?'

আমার ভাইবোনরা কি লীলাবতীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে ?

হয়তো পারবে। শিশুদের অতি সহজেই ভুলানো যায়। স্বর্গের শিশুদের ভুলানো তো আরো সহজ।

মা'র ঘড়ি

বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। মা উপহার হিসেবে বাবার কাছ থেকে একটা হাতঘড়ি পেয়েছেন। আনন্দে মা আত্মহারা। ঘড়ি হাতে পরে তিনি লাজুক হাসি হাসছেন। আমরা ছোটরা মুগ্ধ। আমাদের ধারণা পাশের বাড়ি নাদু-দিলুতের মতো আমরাও ধনি হয়ে গেছি।

মা'র এই বিশেষ উপহার প্রাপ্তির কারণ বাবা প্রমোশন পেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছেন। আমার ধারণা হলো তিনি বিরাট কিছু হয়ে গেছেন। আগে সাইকেলে করে অফিসে যাওয়া-আসা করতেন, এখন নিশ্চয় পুলিশের জিপে যাওয়া-আসা করবেন। ঈদ ছাড়াও আমাদের জন্যে নতুন জামা জুতা কেনা হবে এরকম ক্ষীণ আশাও হলো।

দুঃখের ব্যাপার হলো মায়ের ঘড়ি ছাড়া আমাদের জীবনযাত্রার কোনোরকম পরিবর্তন হলো না। সকালের নাশতা সেই আটার রুটি এবং পেঁপে ভাজি। রুচি বদলের জন্যে মাঝে আটার রুটি এবং চিনি।

কয়েকদিন আগে ব্যাংককে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে রাত কাটিয়েছি। সকালের ব্রেকফাস্ট ফ্রি। বিশাল ডাইনিং হল। ব্রেকফাস্ট হিসেবে কত রকমের খাবারই না সেখানে থরে থরে সাজানো। হঠাৎ করেই মীরাবাজারের রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে শৈশবের নাশতা খাবার দৃশ্য মনে পড়ল। চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে চোখের পাকি সামলালাম।

ঘড়ি প্রসঙ্গে ফিরে যাই। মা তার ঘড়ি অতি যত্নে গোপন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর ভয় আমাকে নিয়ে। তাঁর বড়ছেলে অতি দুষ্টু। সংসারের অনেক জিনিস সে নষ্ট করেছে।

মা ঘড়ি কোথায় রেখেছেন খুঁজে বের করতে আমার মোটেও দেরি হলো না। এক দুপুরে মা যখন ঘুমে আমি ঘড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলাম। নানান

কায়দাকানুন করে ঘড়ির ডালা খোলা হলো। প্রায় চোখে দেখা যায় না এমন একটা স্প্রিং এ-মাথা ও-মাথা করছে। কী অপূর্ব দৃশ্য। কৌতূহল মেটার পর ঘড়ির ডালা বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিলাম।

সন্ধ্যাবেলা বাবা অফিস থেকে ফেরার পর মা তাঁকে জানালেন, ঘড়িটা চলছে না।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, চলবে না কেন ? নতুন ঘড়ি। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘড়ি নিয়ে গেলেন সারাই করতে। ঘড়ি ঠিক হয়ে বাড়ি ফিরল। কয়েকদিন পর আমি সেই ঘড়ি আবারো নিয়ে গেলাম। ঘড়ির ভেতরে স্প্রিং-এর ছোটাছুটি দেখতে ইচ্ছা করল। কী অপূর্ব দৃশ্য।

ঘড়ি আবার নষ্ট।

হযরত শাহজালাল (র:)-এর দরগা'র প্রবেশমুখে প্রধান ফটক।

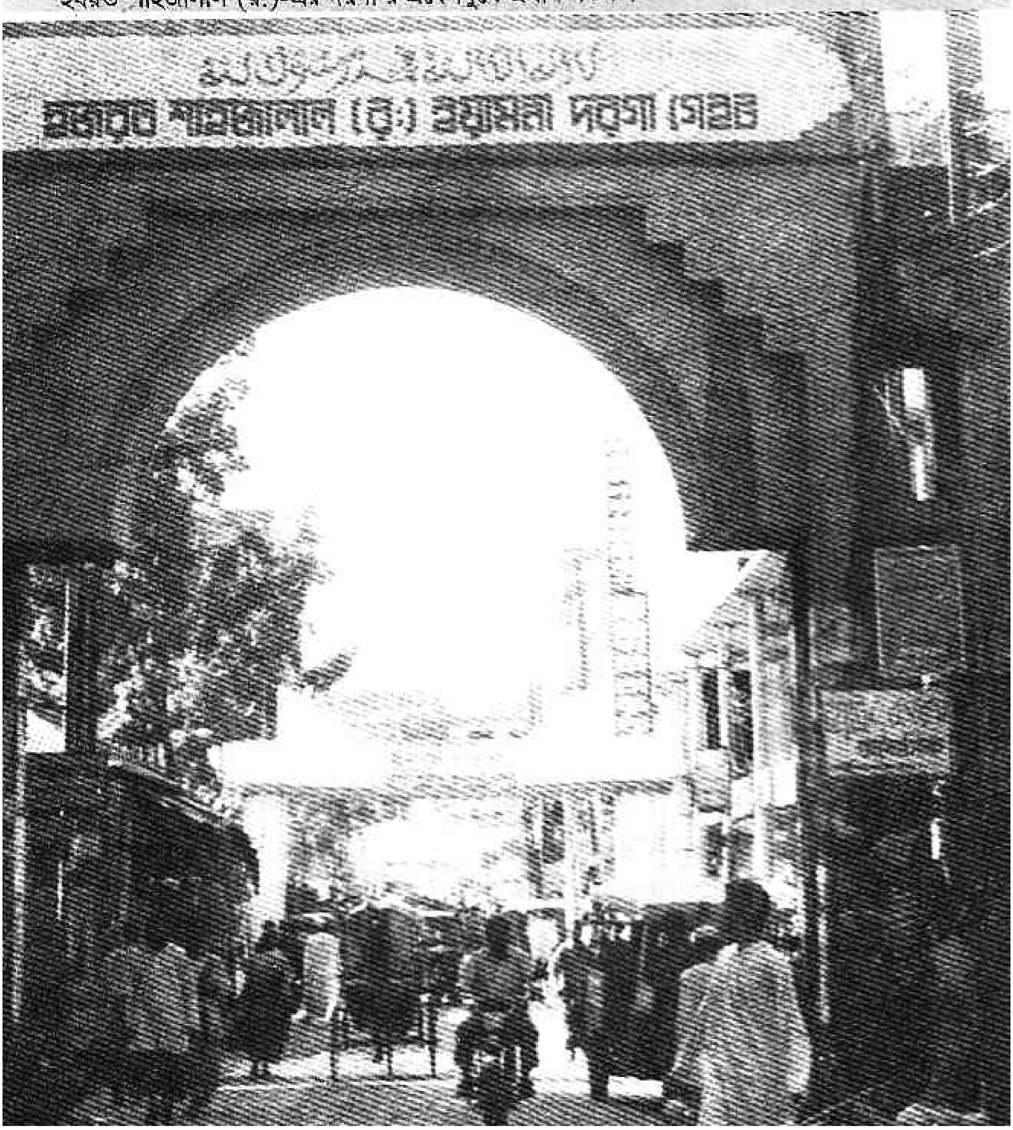

ঘড়ির ব্যাপারে বাবা-মা দু'জনই হতাশা হয়ে গেলেন। দু'দিন পরপরই সারাই করতে পাঠানো হচ্ছে। টাকা খরচ হচ্ছে। বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন এই ঘড়ি আর সারানো হবে না। মা সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন, কারণ ঘড়িটার উপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে তাঁর মনে উঠে গিয়েছিল। বাবার পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রমোশন বাতিল করে তাঁকে আবার আগের পোস্টে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। যে-প্রমোশন উপলক্ষে ঘড়ি সেই প্রমোশনই তো বাতিল।

পঞ্চাশ বছর পরের কথা। ব্যাংককের এক দোকানে শাওন কেনাকাটা করছে। তার ইচ্ছা নুহাশ চলচ্চিত্রের সব স্টাফকে সে একটা করে ঘড়ি উপহার দেবে। সে ঘড়ি পছন্দ করছে, আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ তাকে বললাম, এই ঘড়িটা কেনো তো।

শাওন বলল, এটা তো মেয়েদের ঘড়ি।

আমি বললাম, ঘড়িটা আমি আমার মা'কে উপহার দেব।

শাওন বলল, উনার জন্যে আরো অনেক দামি ঘড়ি কেনো। এটা তো তেমন দামি না।

আমি বললাম, আমার এই ঘড়িটাই দরকার।

ঘড়িটা অবিকল আমার মায়ের প্রথম ঘড়িটার মতো। যেন স্বামীর সেই ঘড়ি সন্তানের হাতে ফিরে এসেছে।

মা এখন পল্লবীতে তার কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে থাকেন। আমি উপহার তাঁর কাছে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা ঘড়ি পছন্দ হয়েছে ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

হাতে পরেছেন ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, ঘড়িটা কি আপনি চিনতে পেরেছেন ?

তিনি জবাব দিলেন না। আমি টেলিফোন রেখে দিলাম।

বড়মামা শেখ ফজলুল করিম

আমার লেখক হয়ে ওঠার পেছনে বড়মামা শেখ ফজলুল করিমের কিছু ভূমিকা আছে। তিনি কবিতা ও গান লিখতেন। কাব্যনাটক লিখতেন। তাঁর লেখা নাটক আমাদেরকে দিয়ে করাতেন। ছবি আঁকতেন। আমাদের ছবি আঁকা শেখাতেন। তবে ছবির মধ্যে শুধু হাতি আঁকতে পারতেন। হাতি ছাড়া অন্যকোনো জীবজন্তু আঁকতে পারতেন না। তাঁর কথা বিশদভাবে বলা প্রয়োজন।

বড়মামা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। আগেই বলেছি, তাঁর প্রধান কাজ ছিল ক্যারাম খেলা এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা। তাঁর অপ্রধান কাজ ছিল আশেপাশের তরুণীদের প্রেমে পড়া। তরুণীদের নিয়ে বিচ্ছেদমূলক গান রচনা করা। এবং তাদেরকে দীর্ঘ চিঠি লেখা। দীর্ঘ চিঠির বাহক আমি। ডাকপিয়নের কাজটা আমার জন্যে আনন্দময় ছিল। প্রতিবার চিঠি নিয়ে গেলে দুই পয়সা (তখন দুই পয়সার মুদ্রা ছিল), কখনো বা একআনা পাওয়া যেত।

তিনি প্রথম চিঠি লিখলেন লায়লা খালার ছোট বোনটিকে। ইনার নাম আমার মনে নেই। এই দুইবোন আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। তাদের বাবা কৃষি কর্মকর্তা ছিলেন। চিঠিটি সেই তরুণী রাগী রাগী মুখে নিল। চিঠি পড়ে বলল, কাজল, চিঠি আনা-আনির কাজ আর কখনো করবে না। এইসব ভালো না। আরেকবার যদি চিঠি আন থাপ্পড় খাবে।

আমি ফিরে এলাম। বড়মামা চিঠি পাওয়ার পর তরুণী কী করল জানতে চাইল। আমি আসল ঘটনা চেপে গিয়ে বললাম, উনি খুশি হয়েছেন। বড়মামার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হলো। তিনি তরুণীকে লেখা আরো কিছু চিঠি আমাকে দিয়ে পাঠালেন। সেইসব চিঠি যথাস্থানে পৌছালাম না। চিঠির সঙ্গে পাওয়া পয়সা খুব কাজে এলো।

মেয়েটির প্রতি মামার প্রেম গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। তিনি শুরু করলেন গান লেখা। আমি মামার গানের সর্বকনিষ্ঠ শ্রোতা। আমি ক্লাস টু'র

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ ভবন।

ছাত্র। সেইসব গানে ভাটি অঞ্চলের এক মেয়ের কথা থাকত। যে ঘাটে বসে থাকত আউলা চুলে। তাকিয়ে থাকত উজানের দিকে।

আমি 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবির জন্যে একটা গান লিখেছিলাম—

একটা ছিল সোনার কন্যা
মেঘবরণ কেশ
ভাটি অঞ্চলে ছিল
সেই কন্যার দেশ
... ...

এখন মনে হচ্ছে এই গানের বীজ বড়মামার রোপণ করা। তাঁর ভাটি অঞ্চলের মেয়ে 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবিতে মূর্ত হয়েছে। এই ছবি দেখে যেতে পারলে তাঁর নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগত। বড়মামা আমাদের সঙ্গেই দীর্ঘদিন থাকলেন। সিলেট থেকে বদলি হয়ে বাবা কত না জায়গায় গিয়েছেন, বড়মামা আছেন আমাদের সঙ্গে। অতি বুদ্ধিমান একজন মানুষ তাঁর সমস্ত মেধা দুলাভাইয়ের সংসারে শেষ করে পড়ন্ত বেলায় নিজ অঞ্চলে চলে গেলেন।

পরম করুণাময় তাঁর কোনো বাসনা পূরণ না করলেও একটি বাসনা কিন্তু পূরণ করলেন। ভাটি অঞ্চলের রূপসী এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো। পুরোপুরি বিয়ে না, আকদ অনুষ্ঠান। বিয়ের লেখাপড়া। শুভদিন দেখে বউ উঠিয়ে আনা হবে।

ভাটি অঞ্চলের এই মেয়েকে দেখতে অনেকের সঙ্গে আমিও গেলাম। বড়মামা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে দিলেন, নজর করে মেয়ে দেখবে। শুনেছি মেয়ে কালো। এটা তো ঠিক না। কালো মেয়ে তো আমি বিবাহ করব না। উজ্জ্বল শ্যামলা পর্যন্ত চলে। তার নিচে চলে না।

মেয়েটিকে দেখার দৃশ্যটি এখনো আমার চোখে ছবির মতো ভাসছে। আমাকে একটি বিশাল বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। পাকা দালান। মেয়েটি পুরনো আমলের খাটের উপর বসে আছে। মেয়েটির পেছনে প্রকাণ্ড জানালা। জানালা দিয়ে হাওর দেখা যাচ্ছে। হাওর থেকে হাওয়া আসছে। হাওয়ায় মেয়েটির চুল উড়ছে। মেয়েটি হাত দিয়ে বারবার তার চুল ঠিক করছে। মেয়েটির একপাশে সবুজ রুমালে কী যেন বাঁধা। সে হাত ইশারা করে আমাকে ডাকল [আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি]। আমি অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছি। কেন জানি খুব লজ্জাও লাগছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটি সবুজ সিল্কের রুমাল আমার হাতে তুলে দিয়ে মিষ্টি করে হাসল। আমার কাছে মনে হলো, মেয়েটার গায়ের রঙ কালো কিন্তু মেয়েটা তো খুবই রূপবতী।

আমি রুমাল নিয়ে ফিরে এলাম। রুমাল খুলে সবাই হকচকিয়ে গেল। রুমালে আছে বিশটা রুপার টাকা। তখন রুপার টাকার প্রচলন ছিল। নজরানা এবং সালামি হিসেবে রুপার টাকা দেয়া হতো। অনেকেই টাকাগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে সাবধানে রাখতে চাইল। আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। প্যান্টের পকেটে সব টাকা থাকত। যেখানে যেতাম টাকার ঝনঝন শব্দ হতো।

একসময় জোর করে টাকাগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিয়েতে কিছু একটা সমস্যা হয়। সমস্যার ধরন আমার কাছে পরিষ্কার না। আমার ধারণা যৌতুক বিষয়ক সমস্যা। এই লেখাটি শুরু করার সময় মা'র কাছে ঘটনা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, ঘটনা দুঃখজনক। যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারা কেউ বেঁচে নেই। কেন আর পুরনো কষ্ট খুঁজে বের করা!

পুরনো কষ্ট আমার খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে। এই কষ্টের সঙ্গে আমার আনন্দও জড়িত। ভাটি অঞ্চলের কিশোরী একটি মেয়ে আমার হাতে সবুজ সিল্কের রুমাল তুলে দিয়েছিল। রুমালভর্তি ঝকঝকে রুপার টাকা। আমি

আরেকটি তথ্য বের করেছি। মেয়ে দেখতে কার মতো। মেয়েটি অবিকল অভিনেত্রী শাওনের মতো।

আচ্ছা, এটা কি প্রকৃতির কোনো খেলা ? সে মানুষকে একই দৃশ্য বার বার দেখাতে পছন্দ করে ? কেন করে ?

আমার নানাজান শক্ত মানুষ ছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন কেউ তাঁর মুখের উপর কোনো কথা বলতে পারে নি। তাঁর হুকুমে মেয়ে উঠিয়ে আনা হলো না। দীর্ঘদিন এই বিয়ে ঝুলে রইল। তারপর ভেঙে গেল। আমি আমার বড়মামাকে নিয়ে একটি গল্প লিখেছি। যে বিয়ে বড়মামা করতে পারেন নি, লেখক হিসেবে সেই বিয়ে আমি তাঁকে দিয়েছি। লেখক ঈশ্বরের মতোই অকৃপণ। লেখক কালো মেয়েকে কলমের এক খোঁচায় পৃথিবীর সেরা রূপবতীদের একজন করে দেয়। মধুর মিলনে সমাপ্তির ক্ষমতা লেখকের আছে। আমার বড়মামাকে জানার জন্যে পাঠকরা গল্পটা পড়ুন। গল্পের শিরোনাম 'বড়মামা এবং রাজকুমারী সুবর্ণরেখা'।

বড়মামা এবং রাজকুমারী সুবর্ণরেখা

আমার বড়মামা ছিলেন খুব প্রতিভাবান মানুষ। প্রতিভাবান মানুষদের সব লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা ছোটরা তা খুব ভালো বুঝতাম। বড়রা মোটেই বুঝত না। বড়দের ধারণা— মামা হচ্ছেন মহাগাধা। এতে অবশ্যি মামা রাগ করতেন না। প্রতিভাবান মানুষরা সহজে রাগ করে না। কেউ রাগের কোনো কথা বললে তারা হাসে। সেই হাসি হচ্ছে ক্ষমাসুন্দর হাসি।

মামাকে গাধা বললে আমরা রাগ করতাম। এই দেখে মামা আমাদের সবাইকে ডেকে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন—

'কাউকে গাধা বললে রাগ করা উচিত না, বরং খুশি হওয়া উচিত। প্রাণিজগতে গাধার স্থান অতি উচ্চে। গাধা হচ্ছে অসম্ভব বিনয়ী ও নিরহংকারী। তাকে বকাঝকা করলে সে কিছু বলবে না। নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। গাধা হচ্ছে খুব পরিশ্রমী। পর্বতপ্রমাণ বোঝা পিঠে নিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাবে। গাধার অন্তরে আছে সঙ্গীতপিপাসা, যা অন্য প্রাণীদের মধ্যে কখনো দেখা যায় না। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে সে তখন সঙ্গীতের প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে গান ধরে। এই গান সে গায় নিজস্ব ভঙ্গিতে। সবাই অবশ্য বিরক্ত হয়। এটা কোনো বড় কথা নয়। বড় কথা হলো— গাধার সঙ্গীতপিপাসু মন। এখন তোরা বুঝলি তো ? গাধা বললে রাগ করার কোনো কারণ নেই, বরং

আনন্দে উল্লসিত হবার কারণ আছে। বুঝলি তো? আহা, গাধাদের কথা ভাবলেই মনটা উদাস হয়— কী মহৎ প্রাণী।'

মামার বক্তৃতা শোনার পর কেউ আমাদের 'গাধা' বলে গাল দিলে বড় ভালো লাগে। মনে খুব আনন্দ হয়। তবে সে আনন্দ মামাই বেশি পান। ঐ মহৎ প্রাণীটির সাথে সবাই মামাকেই বেশি তুলনা করে।

জগতের সব প্রতিভাবান ব্যক্তির মতো মামারও পুঁথিগত পড়াশোনার প্রতি খুব অনীহা ছিল। কারণ পুঁথিগত পড়াশোনায় কী হয়? কিছুই হয় না। আত্মার উন্নতি কি পাঠ্যবই থেকে আসবে? না আসা উচিত? কাজেই মামা পরীক্ষার পড়া তেমন গুরুত্বের সাথে পড়েন না এবং যথারীতি ফেল করেন। সেবারও আই. এ. পরীক্ষার ফল বের হলে পত্রিকায় তাঁর রোল নাম্বার খুঁজে পাওয়া গেল না। মামা উদাস গলায় বললেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কোনো মিসটেক হয়েছে বোধহয়। পরীক্ষা তো ভালোই দিয়েছিলাম। ছাপাখানা বাই মিসটেক রোল নাম্বার বাদ দিয়ে দিল কি-না কে জানে। এরকম প্রায়ই হয়। গত বছর আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড পরিমলের রোল নাম্বার পত্রিকায় ছাপা হয় নি। পরে দেখা গেল হায়ার সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে। এই জাতীয় ব্যাপার রেগুলার হচ্ছে।

আমরা ছোটরা খুব নিশ্চিন্ত হলাম, মামা পাস করেছেন— শুধু 'বাই মিসটেক' তাঁর নাম্বার কাগজে ছাপা হয় নি। বড়রা অবশ্য নিশ্চিন্ত হলেন না। আমার বাবা মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, প্রথম শ্রেণীর গাধা। গ আকারে গা, ধ আকারে ধা। পরপর তিনবার কেউ ফেল করে?

মামা বললেন, দুলাভাই, আমাকে গাধা বলায় আমি মন খারাপ করি নি। কারণ গাধাকে আমি মহৎ প্রাণী বলে মনে করি। তবে দ্বিতীয় বাক্যটিতে আমি আহত হয়েছি। দ্বিতীয় বাক্যে আপনি বলেছেন— গ আকারে গা, ধ আকারে ধা। বানান করে বলেছেন। যেন আমি গাধার বানান জানি না। এটা তো দুলাভাই অন্যায়।

তুমি আমার সামনে থেকে যাও।

বড়মামা গম্ভীর মুখে নিজের ঘরে চলে এলেন। দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল তিনি কবিতা আবৃত্তি করছেন—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে;
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত॥

পরীক্ষায় ফেল করলে মামা রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব বেশি পড়েন। কারণ রবীন্দ্রনাথও না-কি তাঁর মতো ফেলটুস ছাত্র ছিলেন। মামার ধারণা রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর অনেক মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতেন, তিনিও লেখেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি একটা কাব্যনাটকও লিখেছেন। নাম— রাজকুমারী সুবর্ণরেখা। আমরা ছোটরা সেই নাটকে অভিনয় করব। রোজ মামার ঘরে রিহার্সেল হয়। রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন, মামাও ছবি আঁকেন। বিশেষ করে হাতির ছবি আঁকার ব্যাপারে মামার জুড়ি নেই। আমাদের সবার ধারণা রবীন্দ্রনাথও এত সুন্দর হাতির ছবি আঁকতে পারতেন না। মামার আঁকা হাতিগুলি খুব মায়া মায়া চোখে তাকায়।

দুপুরবেলা মা এসে মামার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, এই গাধা, খেতে আয়। ভাত দিয়েছি।

মামা উদাস গলায় বললেন, খাব না বুবু। আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হবো।

পরীক্ষায় ফেল করে মাথা কিনেছিস ? ভাত না খেয়ে ঢং করতে হবে না। তোর ঢং যথেষ্ট সহ্য করেছি।

মামা দরজা খুললেন না। আরো আবেগের সাথে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

অঙ্গে আঁচল সুনীলবরণ
রুনু ঝুনু রবে বাজে আভরণ
সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসব দত্তা।

মা কড়া গলায় বললেন, আর সাধাসাধি করব না। না খেলে না খাবি। পরীক্ষায় ফেল করে ল্যাজ গজিয়ে গেছে। অসহ্য! আমি বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তিনি এসে যা ব্যবস্থা করার করবেন।

আমরা ছোটরা খুব মুষড়ে পড়লাম। বড়মামা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলে আমাদের রিহার্সেল হবে কীভাবে ? 'রাজকুমারী সুবর্ণরেখা' কাব্যনাট্য স্টেজে নামানো যাবে না। বিকেলে সবাই মন খারাপ করে মামার বন্ধ ঘরের দরজার সামনে ঘুরঘুর করছি। মামা দরজা খুলে বললেন, আয় ভেতরে আয়।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

মামা গম্ভীর গলায় বললেন, যথানিয়মে রিহার্সেল হবে। কোনো কিছুই আটকে থাকবে না। শিল্প-সাহিত্যের এই নিয়ম। ঝড় হোক, তুফান হোক, টাইফুন হোক, ভূমিকম্পে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক— শিল্প-সাহিত্য চলবেই।

তুমি তো না খেয়ে আছ মামা।

তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এ বাড়িতে আমাকে যে অপমান করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করার জন্যেই আমি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। তবে তা নিয়ে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই, আমি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করব। শুধু তাই না, আমি আগামী একবছর চুল-দাড়ি কাটব না, নখ কাটব না, গোসল করব না, গায়ে তেল দেব না, বিছানায় ঘুমুব না— মেঝেতে ঘুমুব। একবছর পর আবার আই. এ. পরীক্ষা দেব। রেজাল্ট বের হবে। ফার্স্ট ডিভিশন। তখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আবার যদি ফেল করো ?

মামা এমনভাবে তাকালেন যেন এমন হাস্যকর কথা এই জীবনে শুনেন নি। আমি বড়ই লজ্জা পেলাম। মামা বললেন, রিহার্সেল শুরু করা যাক। কই 'রাজকুমারী সুবর্ণরেখা' কোথায় ?

বকুল আপা এগিয়ে এলেন। তিনি হচ্ছেন রাজকুমারী সুবর্ণরেখা।

এবার ক্লাস সিক্সে উঠেছেন। এমনিতে খুব ভালো, তবে খুব খামচি দেয়। আমরা তাঁর নাম দিয়েছি খামচি রানী। 'রাজকুমারী সুবর্ণরেখা'র শুরুটা এরকম— গন্ধর্ব রাজার ছোট মেয়ে রাজকুমারী সুবর্ণরেখা চলে গিয়েছেন মৃগয়ায়। দলবল রেখে আপনমনে হাঁটছেন। একসময় পথ হারিয়ে ফেললেন। কিছুতেই পথ খুঁজে পান না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাঘ-ভালুক ডাকছে। আকাশের অবস্থাও ভালো না। ঝড় হতে পারে। রাজকন্যা ব্যাকুল হয়ে বললেন—

সুবর্ণরেখা : কে কোথায় আছ— বাঁচাও বাঁচাও।
পথহারা পাখি আমি খুঁজিতেছি নীড়।
আতঙ্কে অধীর,
চারপাশে বন্য পশুপাখি করিতেছে ভিড়।

এই বলে রাজকুমারী ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকবেন। তখন দস্যুসর্দার ভীম নাগ খোলা তরবারি হাতে প্রবেশ করবে। আমার হচ্ছে দস্যু ভীম নাগের পার্ট। আমি রাজকুমারীর কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াব। কর্কশ গলায় বলব—

ভীম নাগ : কে তুমি কাঁদিছ বসি
বনপ্রান্তে একা
বেশভূষা চমৎকার
যাইতেছে দেখা।
চক্ষে অশ্রু জল।
কী তার কারণ
অতি সত্বর করহ বর্ণন ॥

পুরোদমে রিহার্সেল শুরু হয়ে গেল। মামার উৎসাহের সীমা নেই। সবার অভিনয় দেখিয়ে দিচ্ছেন। চড় চাপড়ও মারছেন। আমার গলা যথেষ্ট কর্কশ হচ্ছে না বলে কয়েকটা চড় খেলাম। এইসব নিয়ে আমরা কখনো মন খারাপ করি না। কারণ মামা বলেছেন, অভিনয় ছেলেখেলা নয়। চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুসি না খেলে অভিনয় শেখা যায় না। বড়ই কঠিন বিদ্যা।

এক মাসের মাথায় মামা বনমানুষের মতো হয়ে গেলেন। মাথাভর্তি চুল, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, হাতের নখ বড় বড়। গোসল করছেন না বলে সারা শরীরে এক পরত ময়লা। কাছে গেলে বিকট গন্ধ পাওয়া যায়। মামা নির্বিকার। তিনি বাসায় খাচ্ছেন না। হোটেল থেকে খাবার আসছে। আমার মা দেশের বাড়িতে চিঠি লিখেছেন। আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। চিঠি পেয়ে নানাজান চলে এলে কী হবে কে জানে! নানাজান মানুষটি ছোটখাটো হলেও ভয়ঙ্কর ধরনের। তাঁর স্বভাব-চরিত্র দস্যুসর্দার ভীম নাগের চেয়েও খারাপ। ধমক ছাড়া কোনো কথা বলতে পারেন না। সেই ধমকও ভয়াবহ ধমক। একবার রিকশা ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল হওয়ায় রিকশাওলাকে ধমক দিয়েছিলেন। সেই ধমকে রিকশার সামনের চাকার টায়ার বার্স্ট হয়ে গিয়েছিল।

মা চিঠি লিখেছেন ঠিকই, তবে আমরা সবাই জানি নানাজান আসবেন না। রেলে চড়তে তাঁর খুব ভয়। তাঁর ধারণা রেলগাড়ি বাহন হিসেবে খেলনা ধরনের। এত বড় একটা গাড়ি দু'টা সরু লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সামান্য বাতাস লাগলেই গাড়ি যে পড়ে যাবে এটা তো জানা কথা।

তিনি যে ময়মনসিংহ থেকে রেলে চড়ে সিলেট আসবেন না— এটা নিশ্চিত ধরে নেয়া যায়। এত দূরের পথ হেঁটে আসাও সম্ভব নয়। কাজেই আমরা মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে রিহার্সেল দিতে লাগলাম। অভিনয়ের বেশি দেরি নেই। আমি মামার উপদেশ মতো তেঁতুল এবং দৈ খাচ্ছি, যাতে গলা ভেঙে কর্কশ হয়ে যায়। বকুল আপা চুলে তেল দেয়া বন্ধ করেছেন, কারণ চুল আলুথালু থাকতে হবে।

স্টেজ রিহার্সেলের আগের দিন নানাজান এসে উপস্থিত। তিনি ট্রেনে আসেন নি। সুনামগঞ্জ পর্যন্ত এসেছেন লঞ্চে। সেখান থেকে হেঁটে সিলেট শহরে। বাসে আসা যায়, তিনি আসেন নি। কারণ ট্রেনের মতো বাসও তাঁর অপছন্দ। পেট্রলের ধোঁয়া সহ্য হয় না।

বড়মামা সালাম করবার জন্যে নানাজানের সামনে গেলেন। আমরা সবাই ধরে নিয়েছি— পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধমকটি এখন শুনব। তা শুনলাম না। নানাজান শান্ত গলায় বললেন, ভালো আছিস ?

জি।

নানাজান তাঁর চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ খুলে কাঁচি, ক্ষুর, ব্রাশ এবং সাবান বের করলেন। আগের চেয়েও শান্ত গলায় বললেন, কাছে আয়, মাথা কামিয়ে দেই। জিনিসপত্র সব সাথে করে এনেছি।

মামা সুবোধ বালকের মতো কাছে এগিয়ে গেলেন।

নানাজান যে নাপিতের কাজে এত দক্ষ আমাদের জানা ছিল না। দশ মিনিটের মাথায় বড় মামার চুল-দাড়ি সব উড়ে গেল। মামাকে দেখাতে লাগল সন্ন্যাসী উপগুপ্তের মতো।

নানাজান নিজের কাজে মুগ্ধ হয়ে বললেন, ভুরু দু'টা কামিয়ে ফেলব কিনা ভাবছি। গাধাটার শাস্তি হওয়া দরকার।

মা ক্ষীণ গলায় বললেন, ভুরু কামাবার দরকার নেই বাবা।

নানাজান বিমর্ষ গলায় বললেন, আচ্ছা তাহলে থাক।

তিনি মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই বাঁদর, উঠে দাঁড়া।

মামা উঠে দাঁড়ালেন।

নানাজান বললেন, আশেপাশে পুকুর আছে ?

মামা বললেন, জি আছে।

পুকুরে চলে যা। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকবি। ঘড়ি দেখে পাক্কা তিন ঘণ্টা থাকবি। এই তিন ঘণ্টায় গায়ের ময়লা ভিজে নরম হবে। তারপর তোকে গোসল দেব। নিজের হাতেই দেব। গোসলের সাজসরঞ্জামও সাথে নিয়ে এসেছি। নারিকেলের ছোবড়া এনেছি— ডলে চামড়াসুদ্ধ তুলে ফেলব। তারপর সোডা দিয়ে জ্বাল দিব।

জি আচ্ছা।

কাল ভোরে আমার সঙ্গে মৈমনসিং রওনা হবি। আমরা যাব হাঁটাপথে। লঞ্চে যাওয়া যাবে না, লঞ্চেও পেট্রলের গন্ধ।

বড় মামা মিনমিন করে বললেন, এতটা পথ হেঁটে যাব কীভাবে ?

নানাজান হুঙ্কার দিয়ে বললেন, মোটেই এতটা পথ না। মাত্র ৯৬ মাইল। ঘণ্টায় তিন মাইল করে গেলে ৩২ ঘণ্টা লাগবে। কাল ভোর ছ'টায় রওনা হলে ইনশাআল্লাহ পরদিন দুপুরের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব। পথে কোথাও থামা যাবে না। এখন সামনে থেকে যা, তোর গা থেকে পাঁঠার গন্ধ আসছে।

মামা বিষণ্নমুখে চলে গেলেন।

মা বললেন, এতদিন পর এসেছেন, দু'একটা দিন থাকবেন না ?

নানাজান বললেন, না গো মা। নানান কাজকর্ম ফেলে এসেছি। গাধাটাকে বাড়িতে নিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

কী ব্যবস্থা করবেন ?

বিয়ে দিয়ে দেব। একটা ভালো মেয়ে সন্ধানে আছে।

মা বললেন, রঞ্জুর বিয়ে দেবেন, আমরা কেউ থাকব না ?

এটা কোনো সুখের বিয়ে না। শাস্তির অংশ হিসেবে বিয়ে। ভাত রান্না হলে আমাকে ভাত দাও। খাওয়া-দাওয়া করে শাহ্‌জালাল সাহেবের মাজার জিয়ারত করতে যাব।

এতটা পথ হেঁটে এসেছেন, খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে বিশ্রাম করেন।

নানাজান বললেন, মুখের উপর কথা বলবে না। মুখে মুখে কথা বলা আমার পছন্দ না। ভাত দিতে বলছি ভাত দাও।

মা তাড়াতাড়ি ভাত বাড়তে গেলেন। আমি গেলাম পুকুরপাড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে বড়মামা গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পুকুরে বসে আছেন। মাথা কামানোর জন্যে তাঁকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। পুকুরের চারপাশে প্রচুর লোকজন। তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করছে— কী হইছে ? বিষয় কী ? ও ভাইজান, আপনের হইছে কী ? মামা এইসব প্রশ্নের কোনো জবাব দিচ্ছেন না, তবে বড়ই বিরক্ত হচ্ছেন।

এক বুড়ো লোক এর মধ্যে বলল, মনে হয় পাগল।

অনেকেই তাতে সায় দিল। কয়েকটা কুকুরও দেখলাম খুব মজা পাচ্ছে। মামার দিকে তাকিয়ে ঘেউঘেউ করছে। একটা সাহসী কুকুর পানিতে নেমে সাঁতরে মামার দিকে খানিকটা গিয়ে ভয় পেয়ে ফিরে এলো। মামার জন্যে আমাদের দুঃখের সীমা রইল না। আহা বেচারা!

বড়মামা আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে পরদিন ভোরে ঠিক ছ'টায় নানাজানের সঙ্গে হাঁটাপথে ময়মনসিংহ রওনা হয়ে গেলেন। বকুল আপা খুব কাঁদতে লাগল। বড় মামার জন্যে তার খুব মায়া। তার ধারণা, বড় মামা হচ্ছেন একজন মহা মহা মহা পুরুষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়। কারণ রবীন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করে হাতির ছবি আঁকতে পারতেন না। মামা পারেন।

পনের দিনের দিন সিলেট মেইলে মামা চলে এলেন। তাঁর মাথায় সামান্য চুল গজিয়েছে। মনে হয় এই ক'দিন তাঁকে ঘরে বন্দি থাকতে হয়েছে— কারণ চেহারা ফর্সা হয়ে গেছে। দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। পায়ে নতুন জুতা। তবে মামার চোখ দুটি বিষণ্ণ। ঘরে ঢুকেই মা'কে কদমবুচি

করতে করতে বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে বুবু! জোর করে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে। আত্মহত্যা করব বলে ভেবেছিলাম। আত্মহত্যা হচ্ছে জীবনের কাছে পরাজয়। এই মনে করে আত্মহত্যা করি নি। তবে সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়েও দিচ্ছি না।

মা বললেন, বিয়ে হলো কবে ?

গত পরশু। বিয়ের পরদিন প্রথম সুযোগেই পালিয়ে এসেছি।

সে কী!

মামা উদাস গলায় বললেন, সংসার আমার জন্যে না বুবু। এই ক'দিনে নতুন একটা কাব্যনাট্য লিখেছি। নাম 'জীবন দেবতা'। অসাধারণ জিনিস। খাওয়া-দাওয়ার পর পড়ে শোনাব।

বউ কেমন ?

জানি না কেমন।

বউ দেখিস নি ?

এই প্রসঙ্গটা রাখ তো বুবু। অসহ্য লাগছে।

নাম কী বউ-এর ?

জানি না। নদীর নামে নাম— সুরমা কিংবা কুশিয়ারা কিছু একটা হবে। হু কেয়ারস ? এইসব তুচ্ছ বিষয় আমার কাছে জানতে চেয়ো না তো।

মামা শিস দিতে দিতে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন। ফিরে আসতে পেরে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। আমাদেরও আনন্দের সীমা নেই।

অবশ্যি এই আনন্দ পরদিন বিকেলে নিরানন্দে পরিণত হলো।

নতুন করে রিহার্সেল শুরু হলে দেখা গেল আমরা সবাই পাট ভুলে গেছি। যেভাবে যা বলার কথা সেইভাবে বলতে পারছি না। বনরক্ষক অয়োস্কান্তের দেখা হবে রাজকুমারী সুবর্ণরেখার সঙ্গে। সে দিনহীন বেশে রাজকুমারীকে দেখে— 'একী একী হেরিলাম' বলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। গোঁ-গোঁ শব্দ করতে থাকবে।

রিহার্সেলের সময় অয়োস্কান্ত (পাশের বাড়ির বাবলু) অনেকগুলি ভুল করল। 'একী একী হেরিলামের' জায়গায় বলল— 'একী একী দেখিলাম'। ডানকাত হয়ে পড়ার কথা, পড়ল বামকাত হয়ে। গোঁ-গোঁ শব্দ করার বদলে হিক্কা তুলতে লাগল।

বড়মামার মেজাজ সপ্তমে উঠে গেল। গম্ভীর গলায় বললেন, কানে ধরে এই গাধাটাকে তুল তো। অসহ্য লাগছে। এই ক'দিনে সব খেয়ে বসে আছিস ? যার

শাহজালাল (র:)-এর দরগা প্রাঙ্গনে বহুল আলোচিত জালালী কবুতর।

যা মনে আসছে বলে যাচ্ছিস ? দেখিলাম আর হেরিলাম এক হলো ? শব্দের অর্থ এক হলেও এই দুয়ের মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। তোদের তো বোঝার বুদ্ধি নেই। এত কষ্ট করে একটা জিনিস দাঁড় করিয়েছি, তোরা সব জলে ভাসিয়ে দিলি! আমার হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করছে। এখন থেকে দু'বেলা রিহার্সেল করব। পৌষ উৎসবে নামাতেই হবে। এটা শেষ হবার পর প্রহসন ধরব।

প্রহসনটা কী ?

বললে বুঝতে পারবি না। অন্য জিনিস। হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে যাবে। এই হাসির ফাঁকে ফাঁকে আছে গুরুত্বপূর্ণ সব দার্শনিক কথা। অবহেলিত-শোষিত মানুষের বাণীবদ্ধ অশ্রু।

আমরা নতুন উৎসাহে রিহার্সেল শুরু করলাম। বড়রা সবাই তাতে বিরক্ত হলেন।

বাবা রাগী রাগী গলায় বললেন, এই গদর্ভটাকে কানে ধরে সকাল-বিকাল দু'বেলা উঠবোস করানো দরকার। বাড়িতে তো মনে হয় বাস করা যাবে না।

নানাজান দেশ থেকে চিঠি লিখলেন মা'কে।

মামার আদেশে সেই চিঠি চুরি করে মামাকে পড়তে দিলাম। আমিও পড়লাম। বড়দের চিঠি পড়ে সাধারণত কিছু বোঝা যায় না। তারা সহজ কথা সহজভাবে লিখতে পারেন না। প্যাঁচিয়ে লেখেন। যাই হোক, নানাজান মা'কে লিখেছেন—

মা গো,

দোয়া পর সমাচার এই যে, কুলাঙ্গারটি এক্ষণে নিশ্চয়ই তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছে। আমি বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকার কারণে আসিতে পারিতেছি না। যদি পারিতাম তবে কানে ধরিয়া কুলাঙ্গারকে নিয়া আসিতাম। তাহার যে বিবাহ দিয়াছি সেই সংবাদ নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছ। বিবাহের পরদিন অতি প্রত্যুষে সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যায়। নূতন বৌ খুব কান্নাকাটি করিয়াছে। এই অতীব সুলক্ষণা, বুদ্ধিমতী মেয়েটির দুঃখে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। আমি নিজেও কিঞ্চিৎ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি।

যাহা হউক, এখন কী করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বর্তমান পরিকল্পনা কুলাঙ্গারটিকে কঠিন শাস্তির বিধান করা। কীভাবে তাহা করা যায় তাহাই ভাবিতেছি। শরীর ভালো না বলিয়া কোনো পরিকল্পনাই কার্যকর করিতে পারিতেছি না। আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার জন্যে দোয়া করিবে যাতে অতি শীঘ্রই হাঁটাচলার সামর্থ্য লাভ করি এবং কুলাঙ্গারকে শাস্তি প্রদানে সক্ষম হই। আর কী— ভালো থাকিবে। জামাই এবং পুত্রকন্যাদের আমার দোয়া দিবে। আল্লাহ্ হাফেজ।

দোয়া গো

তোমার পিতা, মোহাম্মদ ইসমাইল খাঁ

চিঠি পড়ে মামা খানিকটা গম্ভীর হলেও খুব কাবু হলেন না। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এত সহজে বিছানা থেকে উঠতে হবে না। নব্বুই মাইল হেঁটে শরীরের কলকজা উল্টেপাল্টে গেছে। ঝাড়া দু'মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে— আপাতত ভয়ের কিছু দেখছি না।

যেদিন আমাদের নাটক হবার কথা সেদিন ভোরবেলায় আমাদের নতুন মামি এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কী সুন্দর! কী সুন্দর! রাজকুমারী সুবর্ণরেখা'র চেয়েও একশ' গুণ সুন্দর। আর মুখে সারাক্ষণ হাসি। যাই শুনছে তাতেই হাসছে। অবশ্যি আমার মা'কে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ খুব কাঁদলেন।

মাও কাঁদলেন।

আমরা জানলাম, নতুন মামি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। মেয়েদের কলেজে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হবে। তিনিও নাকি আগামী বছর আইএ পরীক্ষা দেবেন।

মামা আমাকে ডেকে বললেন, গভীর ষড়যন্ত্র যে চলছে তা বুঝতে পারছিস?

না।

গভীর চক্রান্ত। আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা। ওরা কি ভেবেছে আমি ঘাস খাই? আমার সঙ্গে চালাকি? তুই যা তোর মামিকে বলে আয় সে যেন ভুলেও আমার ঘরে না আসে।

এলে কী হবে মামা?

আমার চিন্তা-ভাবনার অসুবিধা হবে। নতুন প্রহসনে হাত দিয়েছি— প্রহসন লেখা কোনো খেলা কথা না। প্রহসন লিখতে গিয়ে মাইকেল মধুসূদনের মতো লোকের মাথার চুল পেকে গিয়েছিল। শেষে কলপ দিয়ে রক্ষা। যা তোর মামিকে বলে আয় যেন আমার ঘরে না আসে।

আচ্ছা বলছি।

আর শোন্, খাতির জমাবার চেষ্টা করবি না। খেয়াল রাখবি— ও হচ্ছে শত্রুপক্ষ। ও অবশ্যি তোদের হাত করার চেষ্টা করবে। রাম কী করেছিল? রাবণকে পরাজিত করবার জন্যে রাবণের অতি প্রিয়জন বিভীষণকে হাত করেছিল। মনে থাকে যেন, ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। ইতিহাস শুধু পড়লেই হয় না।

দেখলাম মামার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। নতুন মামি ছোটদের হাত করার জন্যে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মিষ্টি মিষ্টি করে সবার সঙ্গে কথা বলছেন, আদর করছেন। আমাদের মধ্যে দুর্বল চরিত্রের যারা তারা অল্প সময়েই মামির দিকে ঝুঁকে পড়ল। আমার ছোটবোন শেফু পুরোপুরি মহিলা বিভীষণ হয়ে গেল। সারাক্ষণ মামির পেছনে পেছনে ঘুরছে। খামচি রানী বকুল আপাও তাই করল। মুখে সারাক্ষণ— নতুন মামি, নতুন মামি! রাগে আমার গা জ্বলে গেল। কতবার বলা হয়েছে, মামি আমাদের শত্রুপক্ষ— তাও বুঝতে পারছে না।

মামি যে আমাদের শত্রুপক্ষ তা নাটকের দিন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখা গেল নাটকের সবচে' করুণ দৃশ্যগুলিতে যেখানে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা উচিত সেখানে মামি খিলখিল করে হেসে ফেলেছেন।

একটা দৃশ্যে রাজকুমারী কাঁদতে কাঁদতে বলছে—

রাজকুমারী : এ-কী অমানিশা মোর চারপাশে
হুতাশন জ্বলে ধিক ধিক।
এ জীবন রেখে কী হবে বলো
জীবন দেয়াই হবে সঠিক।

এবং এটা বলেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখন বনের পাখি বলছে [বনের পাখির ভূমিকায় অভিনয় করছে আমার ছোট বোন শেফু]

বনের পাখি: ঝাঁপ দিও না, ঝাঁপ দিও না কন্যা গো
ঝাঁপ দিও না জলে।

খুবই করুণ দৃশ্য। এই দৃশ্যে মামি এমন হাসি শুরু করলেন যে স্টেজে বনের পাখি নিজেও ফিক করে হেসে ফেলল। সেই হাসি দেখে 'রাজকুমারী সুবর্ণরেখা' মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল এবং তার ডায়ালগ ভুলে গেল। বনরক্ষক অয়োস্কান্ত হাসতে লাগল হো-হো করে। চারদিকে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল।

উইংসের আড়ালে বড় মামা রাগে-দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এটা হচ্ছে স্যাবোটেজ। ইচ্ছাকৃত স্যাবোটেজ। ঐ মেয়ে হচ্ছে শনিগ্রহ। শনি। আমার জীবনে শনি।

ড্রপসিন ফেলে দিয়ে দশ মিনিট পর আবার অভিনয় শুরু হলো। কিন্তু অভিনয় জমল না। করুণ দৃশ্যগুলো এলে হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। নতুন মামি হাসেন, আমার মা হাসেন, বাবা হাসেন। বকুল আপার বাবা হাসেন ঘর কাঁপিয়ে আর বলেন, ভেরি ফানি! বড় মামা পাথরের মতো শক্ত হয়ে যান। একসময় তিনি রাগে কিড়মিড় করতে করতে বলেন— এই মেয়েটাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়া উচিত। প্রথমে একটা গর্ত করে কাঁটা বিছিয়ে দিতে হবে। তার উপর মেয়েটাকে শুইয়ে আরেক প্রস্থ কাঁটা। তারপর মাটিচাপা।

নতুন মামি যেন মামার ঘরে না যান সে বিষয়ে কঠিন আদেশ জারি করা হয়েছিল, তবু এক রাতে দেখলাম মামি মামার ঘরে গেছেন। লুকিয়ে বড়দের কথা শোনা খুব অন্যায়, তবু আমি এবং শেফু জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের

কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। বলা যায় না— রাগের মাথায় বড় মামা যদি নতুন মামির গলা চেপে ধরেন, তাহলে দৌড়ে মা'কে খবর দিতে হবে। নতুন মামি আমাদের শত্রুপক্ষ হলেও মেয়ে খুব ভালো। আমরা শত্রুপক্ষ জেনেও তিনি আমাদের এত আদর করেন যে, আমাদের মিত্রপক্ষ হতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করলেও তো উপায় নেই। বড়মামার দল ছেড়ে তো আমরা মামির দলে যেতে পারি না। একবার একটা দল করলে সেই দল ভেঙে অন্য দলে যাওয়া যায় না।

যাই হোক, জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে মামা-মামির কথা শুনছি। মামা বসে আছেন বিছানায়। মামি দাঁড়িয়ে আছেন টেবিলের পাশে। মামি একটু সাজগোজ করেছেন। পরনে লাল রঙের শাড়ি। পান খেয়ে ঠোঁট করেছেন টুকটুকে লাল। চুল বেণি করে বাঁধা। যা সুন্দর লাগছে মামিকে!

বড় মামা : তোমাকে না নিষেধ করা হয়েছে আসতে। কেন এলে ?

মামি : কাজে এসেছি।

বড় মামা : কী কাজ ?

মামি : তোমার বইপত্রগুলো নিতে এসেছি। তুমি তো আর পড়াশোনা করবে না। আমি পড়াশোনা করছি। পরীক্ষা দেব।

বড় মামা : পরীক্ষা তো আমিও দেব।

মামি : পড়াশোনা না করেই পরীক্ষা দেবে ?

বড় মামা : হুঁ।

মামি : ভালো। আমি পড়ব। বইগুলো আমাকে দাও।

বড় মামা : আমার বইয়ে হাত দেবে না। খবরদার।

মামি : ঠিক আছে হাত দেব না। এমন রেগে রেগে কথা বলছ কেন ? আমি কী করলাম ?

বড় মামা : বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করেছ, তাতেই রাগ করেছি।

মামি : আর প্রবেশ করব না।

বড় মামা : যারা পড়াশোনা, পরীক্ষা এইসব নিয়ে মাতামাতি করে তাদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।

মামি : পড়াশোনা করা কি খারাপ ?

বড় মামা : পুঁথিগত পড়াশোনা করা খুব খারাপ। প্রতিভাবান মানুষেরা কখনো পাঠ্যবই পড়ে না।

মামি : তোমাকে কে বলেছে ?

বড় মামা : বলাবলির তো কিছু নেই— সবাই জানে। পাঠ্যবই থেকে শেখার কিছু নেই।

মামি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, আমাকে তুমি এত অপছন্দ করো কেন ?

বড়মামা বললেন, শুধু তোমাকে নয়, সব মেয়েকেই আমি অপছন্দ করি। মেয়েরা প্রকৃতিতে নিষ্ঠুর। যেমন ধর, একটা কালো স্ত্রী মাকড়সা দৈনিক ২৫০টা পুরুষ মাকড়সাকে হত্যা করে।

আমি কি মাকড়সা ?

মাকড়সা না হলেও কাছাকাছি। এখন যাও, আমি কাজ করব।

কী কাজ ?

ঐ সব তুমি বুঝবে না। একটা প্রহসন লিখছি। মেয়েরা আশেপাশে থাকলে কোনো বড় কাজ হয় না।

ও আচ্ছা, তাহলে যাচ্ছি, বড় কাজ করো।

মামি প্রায় ছুটে বের হয়ে এলেন। খানিকক্ষণ পর শেফু এসে আমাকে কানে কানে বলল, মামি ছাদে দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছে।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

শেফু বলল, কাঁদছে কেন রে, দাদা ?

মামিকে মাকড়সা বলেছে— এই জন্যে কাঁদছে। মামিকে মাকড়সা বলা মামার উচিত হয় নি। অন্যায় হয়েছে।

দাদা শোন, এখন থেকে আমি পুরোপুরি মামির দলে। তুই কার দলে ?

দল ত্যাগ করা নিতান্তই অধর্ম হবে বলে আমি বড় মামার দলেই রইলাম, তবে মন পড়ে রইল মামির দলে।

বড়মামার প্রহসন লেখা শেষ হয়েছে।

প্রচণ্ড হাসির একটা ব্যাপার। এমন মজার যে কিছুক্ষণ পরপর হা-হা করে হাসতে হয়। মামা পুরোটা আমাদের পড়ে শোনালেন। আমাদের একবারও হাসি এলো না। তবে মামা যতবার হাসলেন আমরাও ততবার হাসলাম। পড়া শেষ হলে খাতা বন্ধ করতে করতে মামা বললেন, প্রচণ্ড হাসির হয়েছে, কী বলিস ?

জি মামা।

এই জিনিস মঞ্চে করা যাবে না। হাসির চোটে দর্শক ডায়ালগ বুঝতে পারবে না। এটা আগে খেয়াল করি নি। আগে খেয়াল করলে হাসি আরেকটু কমিয়ে দিতাম। গ্রেট মিসটেক। শ্রোতাদের পাঁচ মিনিট গ্যাপ দিয়ে দিয়ে হাসাতে হয়। হাসি খুব পরিশ্রমের ব্যাপার। তাই একবার হাসির পর খানিকক্ষণ করে বিশ্রাম দিতে হয়।

প্রহসন শেষ হবার পর মামা গোয়েন্দা উপন্যাস লিখতে বসলেন। নাম— 'ভয়ঙ্কর রাতের বিভীষিকা'। রক্ত জমাট করা গোয়েন্দা গল্প। দুর্বল হার্টের লোকের পড়া একেবারেই নিষিদ্ধ। বইয়ের শুরুতেই মামা একথা লিখে দিয়েছেন। খুবই ভয়ঙ্কর গল্প। ছোটদের পড়া নিষিদ্ধ। আঠারো বছরের বেশি না হলে কেউ এই বই পড়তে পারবে না। মামিও পারবেন না, কারণ মামির বয়স আঠারোর নিচে। আমার ধারণা, মামা এই বই লিখছেন যাতে মামি পড়তে না পারেন। মামির খুব খারাপ অভ্যাস— মামা কিছু-একটা লিখলেই তিনি গোপনে সেটা পড়ে ফেলবেন এবং চোখ বড় বড় করে বললেবন, মানুষটার কি মাথা খারাপ ? এইসব কী লেখে ? মামা তাঁর সব লেখা এখন তালাবন্ধ করে রাখেন। সেই তালার চাবি থাকে তাঁর পকেটে।

দেখতে দেখতে দিন কাটতে লাগল। মামি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেন ভাব করতে, লাভ হলো না। বড়রা তো ছোটদের মতো না যে—

'ডাব ডাব ডাব
ভাব ভাব ভাব'

বলে বুড়ো আঙুল ছোঁয়ালেই ভাব হবে। তাদের ভাব হওয়া খুব কঠিন। মামি যতবারই ভাব করতে গেলেন ততবারই নতুন করে ঝগড়া হলো। ঝগড়ার সময় মামা খুব কঠিন কথা বললেন। যেমন,

বড়মামা : আমার সাহিত্য প্রতিভার যে স্বীকৃতি দেয় না, যে আমার রচনা নিয়ে হাসাহাসি করে, তার সাথে আমার বাস করা সম্ভব না। তাছাড়া প্রতিভাবান মানুষদের বিয়ে করা উচিত না। বিয়ে করা ভুল। যদি কেউ তা করে তবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় স্ত্রীর সাথে বাস না করে।

মামি : তুমি প্রতিভাবান কে বলল ?

বড়মামা : (ভয়ঙ্কর রাগ) আমি প্রতিভাবান না ?

মামি : উঁহু। হাতির ছবি আঁকা ছাড়া তুমি আর কিছু পার না।

বড়মামা : কী বললে ?

মামি : যা সত্যি তাই বললাম। তোমার হাতির ছবিও যে খুব ভালো হয় তাও না। হাতির মুখটা দেখতে হয় ইঁদুরের মুখের মতো।

বড়মামা : কী বললে?

মামি : যে ছবি আঁকতে পারে সে সবকিছুর ছবি আঁকতে পারে। বাঘ, ভাল্লুক, গাছপালা, নদী... তুমি শুধু হাতি আঁক, আর কিছু না।

বড়মামা : এতে কী প্রমাণিত হয়?

মামি : এতে প্রমাণিত হয় তুমি ছবি আঁকতে পার না এবং...

বড়মামা : এবং কী?

মামা : এবং আমার ধারণা তুমি খানিকটা বোকা।

বড়মামা : কী বললে? আমি বোকা?

মামি : হ্যাঁ বোকা। বোকা না হলে পরপর তিনবার কেউ আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে?

বড়মামা : (অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর) তুমি এ-ঘর থেকে যাও। আমি তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না।

মামি : তুমি আমার মুখ দেখতে চাও না?

বড়মামা : না। এই জীবনে নয়। এ আমার কঠিন প্রতিজ্ঞা। কলম হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না। না-না-না।

মামি : বেশ, মুখ দেখতে হবে না। আমি কাল ভোরে দেশে চলে যাব। শুধু পরীক্ষার সময় এসে পরীক্ষা দিয়ে যাব।

বড়মামা : বাঁচলাম।

মামি সত্যি সত্যি চলে গেলেন। মা এবং বাবা অনেক বুঝিয়েও তাঁকে রাখতে পারলেন না। শত্রুপক্ষ চলে যাওয়ায় আমার খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। চোখে পানি এসে গেল। তবু এমন ভাব করলাম যেন খুব খুশি হয়েছি।

রাতে বড়মামার ঘরে গিয়েছি। মামা বললেন, এবার নিশ্চিন্ত মনে লেখালেখি করা যাবে, কী বলিস?

জি।

তবে আমি ঠিক করেছি মেয়েটাকে একটা শিক্ষা দেব। ওর ধারণা আমি বোকা।

ভুল ধারণা মামা?

ভুল ধারণা তো বটেই। পরীক্ষায় পাস করলেই মানুষ বুদ্ধিমান হয় না। বরং ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গাধাটাইপ ছেলেপুলে পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। পাঠ্যবই ছাড়া এরা আর কিছু বুঝে না। বইয়ের পোকা ছাড়া তাদের অন্যকিছু ভাবা ঠিক না।

তুমি মামিকে কীভাবে শাস্তি দেবে?

পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়ে দেখিয়ে দেব এটা কিছুই না। বরং হাতির ছবি আঁকা এরচে' অনেক কঠিন।

ফার্স্ট-সেকেন্ড কীভাবে হবে?

সব মুখস্থ করে ফেলব। ঝাড়া মুখস্থ। দাঁড়ি-সেমিকোলনসহ।

পারবে?

পারব না কেন? মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। একটু কষ্ট হবে, উপায় কী? কবিতা মুখস্থ করা সহজ। ইতিহাস, লজিক এইসব মুখস্থ করা কঠিন— তবে অসাধ্য কিছু না। কাল থেকে মুখস্থ করা শুরু করব।

মামা বই মুখস্থ করা শুরু করে দিলেন। বড়ই কঠিন কাজ। এক পাতা মুখস্থ করে মাথা গরম হয়ে যায়, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে মাথা খানিকটা ঠাণ্ডা করে দ্বিতীয় পাতা মুখস্থ করেন। তৃতীয় পাতা মুখস্থ করার পর দেখা যায় প্রথম পাতাটা ভুলে গেছেন। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। মামা হাল ছাড়েন না। প্রতিভাবান মানুষরা সহজে হাল ছাড়েন না। সাধারণ মানুষের সাথে এইখানেই তাঁদের তফাত। মামা তো আর সাধারণ মানুষ না।

এইবার গল্পের শেষটা বলি।

মামি আমাদের সাথে আছেন। পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। পরীক্ষা দেয়ার পর আর ফিরে যান নি। অবশ্যি মামার সাথে তাঁর ভাব হয় নি। রাতে শেফুর সাথে ঘুমান। মামার সাথে কখনো দেখা হলে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখেন। বড় মামা তাঁর মুখ দেখতে চান না— এটা বোধহয় তাঁর খুব মনে লেগেছে। বড়রা ছোটদের মতো না। কেউ কোনো একটা কথা বললে তাঁরা অনেক দিন মনে পুষে রাখেন।

যাই হোক, এসব নিয়ে আমরা এখন মোটেই চিন্তিত না। আমাদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। নতুন নাটকের রিহার্সেল হচ্ছে। এবারের নাটকও রাজকুমারী সুবর্ণরেখাকে নিয়ে। খুব করুণ নাটক। আগের বারের চেয়েও অনেক করুণ। নাটক দেখতে হলে চোখ মোছার জন্যে রুমাল আনলে চলবে না। বিছানার চাদর আনতে হবে, এমন অবস্থা। আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট হবার আগেই নাটক নামিয়ে ফেলতে হবে। না, পরীক্ষা নিয়ে মামার কোনো ভয় নেই। খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন, বাংলা পরীক্ষায় তিনটা বাড়তি খাতা নিয়েছেন। এই অবস্থায় নিজেকে নিয়ে তাঁর চিন্তা নেই। তবে তাঁর ধারণা রেজাল্টের পর মামি যখন দেখবে কাগজে তাঁর নাম নেই আর মামার নাম প্রথম বিভাগে তখন ভয়াবহ শক খাবে। এই অবস্থায় মামি নাটক দেখতে উৎসাহ পাবে না।

আমি বললাম, মামি নাটক না দেখলে কী হবে ? না দেখলেই তো ভালো। আগের বারের মতো হাসাহাসি করবে।

মামা বললেন, তোর মামিকে দেখানোর জন্যেই এই নাটক। ওর কথা মনে করেই লেখা।

কেন ?

ওর ধারণা আমার প্রতিভা নেই। নাটক দেখলে বুঝবে প্রতিভা কত প্রকার ও কী কী ?

আমাদের রিহার্সেল পুরোদমে চলছে। এর মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আগে আগে আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট হয়ে গেল। বাবা গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ নিয়ে ঘরে এলেন। মামা হাসিমুখে বললেন, অবস্থা কী দুলাভাই ?

বাবা বললেন, অবস্থা ভালোই।

মামা বললেন, অবস্থা যে ভালো তা জানি। কতটা ভালো সেটা বলেন। ফার্স্ট ডিভিশনে আছি ?

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, খবরের কাগজে তোমার নাম নেই। কোথাও খুঁজে পেলাম না।

ও আচ্ছা।

আগের তিনবার যেমন ছাপাখানার ভুলে তোমার নাম উঠে নি, এবারো বোধহয় তাই হয়েছে।

বড়মামা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর জানলাম নতুন মামি পাস করেছেন। তিনটা মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশন

পেয়েছে। মামি ঐ তিনজন মেয়ের মধ্যে প্রথমজন।

বড়দের কাণ্ডকারখানা আমি কিছু বুঝি না। মামি পাস করেছেন, তাঁর শত্রু ফেল করেছে, মামির উচিত খুশি হওয়া। তিনি কেঁদে-টেঁদে অস্থির হয়ে গেলেন। কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না।

মা'কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আহা বেচারা কী কষ্টটাই না পাচ্ছে! আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

দুপুরে বড়মামা খেতে এলেন না। মামিও খেলেন না। দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন। মামা মুখ শুকনো করে রাতে ফিরলেন। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, তোর মামিকে একটু আমার ঘরে আসতে বল তো।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন ?

সে এত ভালো একটা রেজাল্ট করেছে, তাকে অভিনন্দন দেওয়া উচিত না ? মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। সহজ কথা তো না। নিতান্ত গ্রামের একটা মেয়ে। যা করেছে নিজের চেষ্টায় করেছে। কিছু ফুল নিয়ে এসেছি, ভাবছি ফুলগুলো দেব। এমন পচা শহর, ফুল পাওয়া যায় না। দশটা গোলাপ জোগাড় করতে জীবন বের হয়ে গেছে।

আমি বললাম, তোমার ঘরে আসতে বললে মামি আসবে বলে তো মনে হয় না।

আসবে না ?

উঁহু।

আমারও তাই ধারণা। না এলে ফুলগুলো চুপিচুপি দিয়ে আসিস।

কী আশ্চর্য! মামিকে বলতেই তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। সাথে সাথে রওনা হলে গেলেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি জীবনে এত আনন্দিত হন নি। বড়দের কাণ্ডকারখানা বোঝা খুব মুশকিল।

আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে কী হয় দেখছি।

মামি ঢুকলেন ফোঁপাতে ফোঁপাতে। মামা তাঁর হাতে ফুলগুলো দিতেই তিনি শব্দ করে কেঁদে উঠলেন, ফুলগুলো ছুড়ে দিলেন মেঝেতে।

মামা বিড়বিড় করে বললেন, তুমি অবিকল রাজকুমারী সুবর্ণরেখা'র মতো কাঁদছ। এরকম করে কেঁদো না। তোমার কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়ে যাচ্ছে। তারপর আরো অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো। মামা করলেন কী... থাক আমি বলব না। ছোটদের সব কথা বলতে নেই। আমি জানালার পাশ থেকে

সরে এলাম। ছোটদের সবকিছু দেখতেও নেই। তাছাড়া আমার নিজেরও তখন খুব কান্না পাচ্ছে। দেখতে চাইলেও পারতাম না। ঝাপসা চোখে কি কিছু দেখা যায়?

বড়মামার জীবনের গল্প একজন ব্যর্থ মানুষের জীবনের গল্প। সুন্দরকে স্পর্শ করার বাসনা তাঁর ছিল। সুন্দর তাঁকে সেই সুযোগ দেয় নি। কোরান শরীফে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন— 'কাউকে কাউকে আমি হিসাব ছাড়াই দেই, আবার কাউকে কিছুই দেই না। ইহা আমার ইচ্ছা।' বড়মামা কি দ্বিতীয় দলে?

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি ঢাকা থেকে ছুটে গেলাম। সন্ধ্যার পর পর উপস্থিত হলাম। আলো এবং অন্ধকারের সে এক অদ্ভুত সময়। মৃত্যুশোকে কাতর বাড়িতে আমি কখনো যাই না। আমার ভালো লাগে না। যাকে জীবিত দেখেছি তাঁকে মৃত দেখতে ইচ্ছা করে না।

উঠোনে বড়মামার শবদেহ শাদা চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে। মুখ সামান্য খোলা। আগরবাতি জ্বলছে। খাটিয়ার চারপাশে অনেক মোমবাতি। তাতেও যেন অন্ধকার কাটছে না। সবাই শেষবারের মতো প্রিয় মুখ দেখে যাচ্ছে। মা আমাকে বললেন, যা শেষবারের মতো তোর বড়মামাকে দেখে আয়। আমি বললাম— না।

বাড়ির পেছনে বড়মামার জন্যে কবর খোড়া হয়েছে। জায়গাটা জঙ্গলের মতো। কোনো লোকজন নেই। শুধু গোরখোদক হারিকেন জ্বালিয়ে টুলের উপর বসে আছে। কবর তৈরি হয়ে যাবার পর সারাক্ষণই না-কি কাউকে কবরের পাশে থাকতে হয়। এই নিয়ম। গোরখোদক নিয়ম রক্ষা করছে। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমাদের মামার দিক থেকে দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তিনি বললেন, নাতি, কখন আসছ?

কিছুক্ষণ আগে এসেছি। আচ্ছা নানা, আমি যদি কিছুক্ষণের জন্যে কবরে নামি তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কবরে নামবে কেন?

আমি বললাম, মৃত অবস্থায় তো নামতেই হবে, জীবিত অবস্থায় নেমে দেখি কেমন লাগে।

তিনি বললেন, আচ্ছা নামো।

তিনিই ধরাধরি করে আমাকে নামালেন। আমি বসলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের জগতে কিছু একটা ঘটল। ভয়ঙ্কর কিছু। সব অন্ধকার হয়ে গেল।

সাধারণ অন্ধকার না। এই অন্ধকার সীসার পাতের মতো। অথচ কবরের বাইরেই একজন হারিকেন হাতে বসে আছে। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশে নক্ষত্রের আলো থাকার কথা। তাও নেই। আকাশ ঘন অন্ধকার। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল আকাশের দিকে তাকানোর পর পর, আমার জগৎ শব্দহীন হয়ে গেল। মরাবাড়ির কোনো শব্দ পাচ্ছি না। ঝিঁঝি পোকার শব্দ না। বাতাসের শব্দ না। আমার নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ নেই। হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ নেই। এইটাই কি মৃত্যু ? আলো ও শব্দহীন অসীম এক ভুবন। আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, দাঁড়াতে পারলাম না। চিৎকার করতে চেষ্টা করলাম, তাও পারলাম না। একসময় আমার মনে হলো আমি তলিয়ে যাচ্ছি। অতি দ্রুত নিচে কোথাও প্রবেশ করছি। দ্রুতগতির শব্দ আছে, অথচ আমি যে তলিয়ে যাচ্ছি শব্দহীনভাবেই তলাচ্ছি। এই সময় হঠাৎ কবরের ভেতর উপর থেকে হারিকেন হাতে একটা হাত নেমে এলো, কেউ বলল, নাতি শখ মিটছে ? এখন উঠবা ?

তিনি আমাকে হাত ধরাধরি করে উঠিয়ে আনলেন।

কবরের ভেতর আমার কী হয়েছিল তা নিয়ে ভাবি। উত্তর পাই না। মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে গেলে তাঁরা বলবেন, মৃত্যুচিন্তা, শোক, ভ্রমণজনিত ক্লান্তি— সব মিলিয়ে এক ধরনের ট্রমা; এর বেশি কিছু না।

আমি জানি, আমার অভিজ্ঞতা ট্রমা না। অন্য কিছু। যদি আরো কিছুক্ষণ থাকতে পারতাম তাহলে অভিজ্ঞতা পূর্ণ হতো।

যে রহস্যময় জগতে আমরা বাস করি তার অনেক কিছুই আমরা জানি, আবার অনেক কিছুই জানি না। না জানার পাল্লাটাই মনে হয় ভারী।

গরম পীরের মাজার

'গরম পীরের মাজার' নামটার মধ্যেই গা ছমছমানি ব্যাপার আছে। নামই বলে দিচ্ছে, মাজারে যিনি শায়িত তাঁর মেজাজ ভালো না। তুচ্ছ বিষয়েও তিনি রেগে যেতে পারেন। তিনি রেগে গেলে বিপদ আছে। বাসার সামনের এই মাজারটির বিষয়ে ছোটবেলাতেই আমার ভেতর এমন একটা ধারণা ঢুকল। মাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় পাওয়া যায় ধূপকাঠির গন্ধ। এই গন্ধটাও যেন কেমন কেমন। মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। সন্ধ্যাবেলা মাজারের বিভিন্ন খোপে খোপে জ্বলে মোমবাতি। রহস্যময় আবহ তৈরি হয়। এশার নামাজের পর কিছু মুসুল্লি জিকিরে বসেন। সমবেত জিকির ধ্বনি বুকে ধাক্কার মতো লাগে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনও নমস্কারের ভঙ্গিতে মাজারের বাইরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। শিশুর মনে রহস্যের পর রহস্য দানা বাঁধে।

মাজারের মসজিদে শুক্রবারে বাদ জুমা শিন্নি দেয়া হতো। বিভিন্ন বাড়ি থেকে শিন্নি আসত। নামাজের শেষে কলাপাতায় সেই শিন্নি ভাগ করে দেয়া হতো। কী সুস্বাদু ছিল সেইসব খাবার। সবাই একটা করে কলাপাতা নিত, আমি নিতাম দু'টা। একটা আমার জন্যে, একটা আমার বোনের জন্যে। যিনি পরিবেশন করতেন তিনি যদি চোখ কুঁচকে তাকাতেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতাম, এটা আমার বোনের; সে তো মসজিদে আসতে পারে না। পরিবেশনকারী তখন আর আপত্তি করতেন না।

মসজিদে জমজমাট খাওয়া হতো রোজার সময়, ইফতারিতে। যার বাড়িতে ভালো যা কিছু তৈরি হতো তার একটি অংশ আসত মসজিদে। অসংখ্য মাটির সানকি ধোয়া থাকত। খাবার সানকিতে সাজিয়ে দেয়া হতো। আজানের পর পর মুসুল্লিরা পানি খেয়ে রোজা ভেঙেই নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। নামাজ শেষ হবার পর ইফতারি। তার আগে না। ভালো ইফতারির লোভে আমি এবং আমাদের

কাজের ছেলে রফিক বেশ কয়েকবার ইফতারির সময় মসজিদে ঢুকেছি। আমাদের প্রথম প্রশ্ন যা করা হয়েছে তা হলো, রোজা রেখেছ ?

জি-না।

তাহলে যাও। ইফতার রোজাদারদের জন্যে।

মুখ শুকনা করে চলে এসেছি। তখন খারাপ লেগেছে। এখন বুঝি ক্ষুধার্ত মানুষ অন্যকে খাদ্যের ভাগ দিতে পছন্দ করে না। সারাদিন রোজার পর ক্ষুধার্ত মানুষ চায় না একদল শিশু খাদ্যে ভাগ বসাক।

ঈদের নামাজের সময়ও দেখেছি শিশুদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। বাবার পাশে নামাজ পড়তে দাঁড়ালাম। চারদিকে এত মানুষ, ভয় ভয় লাগছে। হঠাৎ মওলানা সাহেব ঘোষণা করলেন, বড়দের মাঝে বাচ্চারা থাকলে নামাজের ক্ষতি। বাচ্চাদের পেছনে যেতে হবে। অনেক বাচ্চা বাবাকে ধরে শুরু করে কান্না। বাবারাও বিব্রত, কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, নবীজীর (দ.) প্রথম জীবনীকার আবু ইসহাক লিখেছেন— অনেক সময় দেখা যেত নবীজী (দ.) নামাজ পড়ছেন। তাঁর কাঁধে ঝুলে আছেন তাঁর আদরের নাতি। সেজদার সময় নাতি পড়ে যাবে ভেবে তিনি নাতিকে কাঁধ থেকে নামাতেন। সেজদার পর আবার কাঁধে তুলে নিতেন।

গরম পীর (দাদা পীর)-এর মাজারের বর্তমান চিত্র।

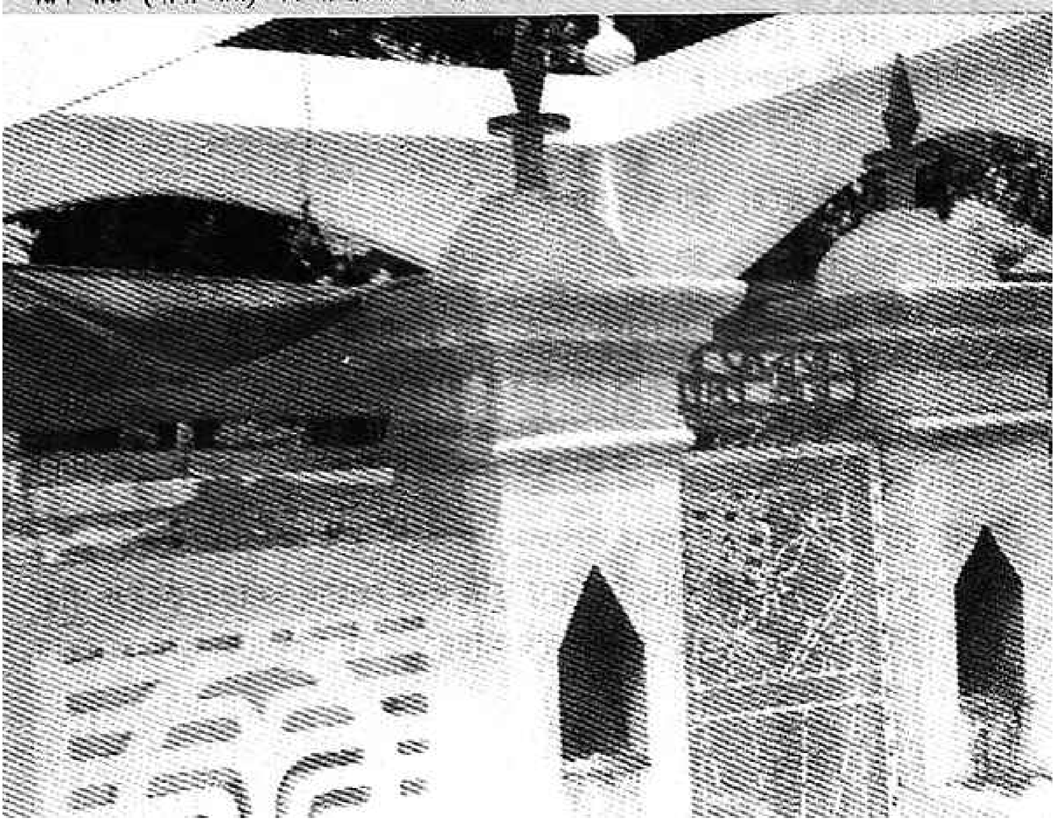

শিশুদের প্রতি নবীজীর (দ.) এই গভীর মমতার কথা কি আমাদের মৌলানারা জানেন না ?

থাকুক এই প্রসঙ্গ, অন্য কথা বলি। এক দুপুরে আমরা বাচ্চারা লুকোচুরি খেলছি। 'টুঁ' দেয়ার পর লুকাতে হবে। কেউ যেন খুঁজে না পায়। আমি অসীম সাহসে দৌড় দিয়ে মাজারে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইলাম। জোহরের নামাজ হয়ে গেছে, মাজারে কেউ নেই। লুকোচুরির সাথিরা কেউ আমাকে পেল না। লুকিয়ে থাকার জন্যে আমি একটা চমৎকার জায়গার সন্ধান পেয়ে গেলাম। এরপর থেকে লুকোচুরি খেলা হলেই কেউ আমার খোঁজ পায় না। আমি কোথায় যাই, এই রহস্য ভেদ হয় না।

একদিনের কথা— মাজারে লুকিয়ে আছি। প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হয়েছে। বাথরুম করার জন্যে বের হতে পারছি না। বের হলেই ধরা পড়ব। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাজ সেরে ফেললাম। ঘটনাটা একজন মুসুল্লি দেখে ফেললেন। কয়েকটা চড় থাপ্পড় মেরে বললেন, তুই মাজারে পেসাব করেছিস, তুই তো এখন রক্ত পেসাব করতে করতে মারা যাবি। তুই জানিস না এটা কার মাজার ?

ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘটনা হলো— আমার পেসাব বন্ধ হয়ে গেল। বাকি দিনে এবং রাতে এক ফোঁটা পেসাব হলো না। কয়েকবার বাথরুমে গেলাম, বাথরুম করতে গেলেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা। কাকে এই সমস্যার কথা বলব ? বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে গেলাম। গভীর রাতে প্রচণ্ড ব্যথায় ঘুম ভাঙল। আমি কাঁদছি, কান্নার শব্দে বাবার ঘুম ভাঙল। বাবা বললেন, কী সমস্যা ?

পিসাব করব।

পিসাব করলে করো, কাঁদছ কেন ?

পিসাব হয় না।

কেন হবে না ?

আমি ঘটনাটা বললাম। জানি তিনি খুব রাগ করবেন। প্রচণ্ড ধমক দেবেন, তবে চড় থাপ্পড় মারবেন না। ছেলেমেয়েদের গায়ে এই মানুষটা জীবনে কখনো হাত তোলেন নি।

বাবা গম্ভীর মুখে ঘটনা শুনে বললেন, কাজটা তুমি অন্যায় করেছ। ভুল করেছ। তবে এই কাজের শাস্তি হিসেবে তুমি রক্ত পেসাব করতে করতে মারা যাবে না। কারণটা মন দিয়ে শোন— যে মাজারের যে মানুষকে তুমি অসম্মান

করেছ তিনি সাধারণ মানুষ না। অনেক উপরের স্তরের মানুষ। একটা শিশু কী ভুল করেছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। শিশুকে শাস্তি দেবার প্রশ্নই উঠে না। বুঝেছ?

জি।

যাও, এক গ্লাস পানি খাও।

আমি এক গ্লাস পানি খেলাম। বাবা বললেন, এখন বাথরুমে যাও, পিসাব করো।

আমি বাথরুমে গেলাম। স্বাভাবিকভাবে বাথরুম করে বিছানায় শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বছর দুই আগে গরম পীরের মাজারে গিয়েছি। মাজারের বাইরে দাঁড়িয়ে শিশুকালের অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। ক্ষমা প্রার্থনার সময় বাবার কথাও মনে পড়েছে। সব বাবাকেই ছেলেমেয়েদের সাইকিয়াট্রিস্টের ভূমিকা পালন করতে হয়। কিছু বাবা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আবার অনেকেই পারেন না। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলছি— সাইকিয়াট্রিস্টের ভূমিকা আমি ভালোই পালন করতে পারি। কারণ আমার শিক্ষক ভালো ছিলেন।

নানাজানের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম

আমাদের বাসায় একটা ফর্সি হুক্কা ছিল। হুক্কার তলাটা ছিল পিতলের। হুক্কাটা খাটের নিচে থাকত, তার উপর ধুলা ময়লা জমত। বছরের কোনো একদিন দেখা যেত আমার মা'র হাতে হুক্কা। তাঁর মুখভর্তি হাসি। তিনি আনন্দে ঝলমল করতে করতে বলবেন, ওরে তোরা কই ? হুক্কা পরিষ্কার কর। পিতল যেন ঝকঝক করে।

আমরা আনন্দে দিশাহারা; কারণ ঘটনা বুঝে গেছি। নানাজান আসছেন। মা'র কাছে খবর এসে গেছে। হুক্কা পরিষ্কারের ধুম পড়ে গেল। বালি দিয়ে ঘষা হচ্ছে, লেবুর রস দিয়ে ঘষা হচ্ছে। তবু মন ভরছে না। আরো পরিষ্কার হতে হবে। আরো ঝকমকে।

পিতল পরিষ্কার হবার পর হুক্কার দায়িত্ব চলে যেত বাবার হাতে। তিনি পানি ভরতেন। নল টেনে দেখতেন সব ঠিক আছে কি না। বাতাস লিক করছে কি না। টিক্কা তামাক কেনা হতো। বাবা ফাইনাল টান দিয়ে বলতেন, সব ঠিক আছে। তাঁকে আনন্দিত মনে হতো।

আমার বাবা শ্বশুর-শাশুড়ির ভক্ত ছিলেন। সারাজীবনই তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছেন। কথা বলেছেন অতি বিনয়ের সাথে। তাঁদের আব্বা-আম্মা বলে যে সম্বোধন করতেন তাতে কোনো খাদ ছিল না। তিনি তাঁর নিজের বাবা-মাকে যে চোখে দেখেছেন শ্বশুর-শাশুড়িকেও সেই চোখেই দেখেছেন। সে সময়ে এটাই ছিল মূলধারা। তার কারণও অবশ্যি ছিল। পঞ্চাশ বছর আগে সব শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে জামাই শুধু যে তাদের কন্যার স্বামী তা-না, তাদের পুত্রের চেয়েও কাছের একজন। জামাই আসার সংবাদেই সাজ সাজ রব পড়ে যেত। সেই সাজ শুধু এক বাড়িতে না, অঞ্চলের সব বাড়িতে। জামাই তো এক বাড়ির না, অঞ্চলের সবার। সব বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে জামাইকে খানা খেতে হবে।

না করা যাবে না। যদি সবাই মিলে জামাইকে আদরযত্ন না করে, তাহলে অঞ্চলের বিরাট বদনাম হবে।

খুব ছোটবেলায় বাবার সাথে নানার বাড়িতে যেতাম। জামাই আদরের নমুনা দেখেছি। একটা উদাহরণ দেই। জামাইয়ের দাওয়াত পড়েছে অন্য এক বাড়িতে। সেই বাড়ির প্রধান দাওয়াতের আগের দিন উপস্থিত। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে।

জামাই, আপনার কী মাছ পছন্দ ?

আমার সব মাছই পছন্দ।

সব মাছ পছন্দ বুঝলাম। বিশেষ কোনো একটা বড় মাছের নাম বলুন।

আমার সবচে' পছন্দ ছোট মাছ।

এইটা কী কথা বললেন ? কোনো একটা বড় মাছের নাম বলেন।

বাবা অনেক ভেবে টেবে বললেন, বোয়াল।

বোয়াল মাছ তো আপনাকে খাওয়াতে পারব না। বোয়াল জাতের মাছ না। জাতের মাছের নাম বলেন। রুই, কাতল, চিতলের মধ্যে বলেন।

রুই মাছ।

আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি উঠে গেছেন। মাছ হাটায় লোক চলে গেল সবচে' বড় রুই যেন চলে আসে।

খাবার সময় জামাইয়ের পাতে তুলে দেয়া হবে মাছের মাথা। রুই মাছের অন্য কোনো অংশ না। একই মাছ দিয়ে তিন-চার পদ হবে না। ভাজা হবে অন্য কোনো মাছ, সালুন হবে আরেক পদের মাছের। মাছের পদ হবে আট দশ রকমের। তারপর আসবে মুরগির কোরমা, ক্ষেত্রবিশেষে খাসির মাংস। গরুর মাংস কখনো না। গরুর মাংস জাতের মাংস না। জামাইয়ের পাতে গরুর মাংস দেয়া জামাইকে অপমান করার মতো অপরাধ।

জামাইয়ের পাতে তিন-চারজন খেদমতগার যে পরিমাণ খাবার তুলে দিত তা দেখলে গামা পালোয়ানও ভিরমি খেতেন।

বাবা ছিলেন স্বল্পাহারী মানুষ। দুই চামচ ভাত, ভর্তা, ছোট মাছের সালুনে তাঁর খাওয়া সীমাবদ্ধ। শ্বশুরবাড়িতে এই মানুষটার কী অবস্থাই না হতো!

আজকালকার জামাইরা বঞ্চিত। জামাই আদরের তারা কিছুই দেখে না বলে বিশ্বাস। এখনকার জামাইকে আদর করার মতো সময় শ্বশুর-শাশুড়িরইবা

কোথায় ? জামাইরাও সেরকম। শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মা ডাকে না বললেই হয়। হুঁ হাঁ বলে কোনোমতে চালিয়ে নেয়া।

এক মদের আসরে শ্বশুর-জামাইকে একসাথে মদ্যপানও করতে দেখেছি। আধুনিক জামাই, তারচেয়েও আধুনিক শ্বশুর, কী করা যাবে!

পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। নানাজানের বেড়াতে আসা আমাদের কাছে ছিল ঈদের দিনের আনন্দের চেয়েও অনেকগুণ বেশি আনন্দের। ঈদ একদিনেই শেষ। নানাজানেরটা একদিনেই শেষ না। তিনি যতদিন থাকবেন ততদিনই ঈদ। কারণ—

১. তিনি শাহজালাল সাহেবের মাজারে বেশ কয়েকবার যাবেন, প্রতিবারই নাতি-নাতনিদের নিয়ে যাবেন। হালুয়া কিনে দেবেন। মাজার শরীফের সেই হালুয়া কত না স্বাদের। বিশ গজ দূর থেকেও ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া যায়। তিনি আমাদের দেখাতে নিয়ে যাবেন মাজারের শিন্নি রান্নার পাতিল। পাতিলের ভেতরটা যেন দেখতে পারি সে-জন্যে আমাকে উঁচু করে ধরে রাখবেন। পাতিলের ভেতর দেখার কিছু নেই বলে ধমক দেবেন না।

২. তিনি যতবার বাসা থেকে বের হবেন আমাদের সাথে নেবেন। তাঁর সাথে কত কী দেখেছি— আলী আমজাদের ঘড়ি। লোহার পুল। যেদিন আমাদের সঙ্গে নিতেন না সেদিন ফেরার সময় কিছু না কিছু নাতি-নাতনিদের জন্যে আনবেন। বাইরে থেকে খালি হাতে ফেরার মানুষ তিনি না।

৩. তিনি খেতে বসবেন নাতি-নাতনিদের দু'পাশে নিয়ে। খাওয়ার মেনু উন্নত। ডাল, ডালের বড়া না। নানাজান তাঁর মেয়ের আর্থিক সামর্থ্যের কথা জানেন। তিনি সেই প্রস্তুতি নিয়েই আসেন। প্রায়ই বাজারে যান, প্রচুর কেনাকাটা করেন।

৪. তিনি মজলিশি মানুষ ছিলেন। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে নানা মজার মজার গল্প করেন।

৫. তিনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় মা কখনো আমাদের বকাঝকা করেন না। বড় অপরাধেও না। সন্ধ্যাবেলা পড়তে না বসলেও কিছু বলেন না।

নানাজান বছরে একবার বড় মেয়েকে না দেখে থাকতে পারেন না। কাজেই প্রতি বছর আমাদের ভেতর আনন্দের ঝড় তুলতে তিনি উপস্থিত হন। তিনি চলে

যাবার সময় আমরা কাঁদতে কাঁদতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর রিকশার পেছনে দৌড়াই।

এখন দাদাজান প্রসঙ্গ। তিনি একবার মাত্র সিলেট এসেছিলেন। দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণের একজন সুফি সাধক টাইপ মৌলানা। মুখভর্তি ধবধবে সাদা দাড়ি। পায়জামা সাদা, পাঞ্জাবি সাদা। সেই পাঞ্জাবির ঝুল মাটি স্পর্শ করে করে অবস্থা।

তিনি বেশকিছু দিন থাকবেন। আমার মা তটস্থ— কোনো কিছুতে যদি শ্বশুরের অমর্যাদা হয়! মা'র দেখাদেখি আমরাও তটস্থ। আমাদের উপর হুকুম জারি হয়েছে, দাদাজান যতক্ষণ ইবাদত বন্দেগি করবেন ততক্ষণ আমরা কোনো শব্দ করতে পারব না। কথাবার্তা বলতে হবে নিচু গলায়। সমস্যা হচ্ছে, উনি সারাক্ষণই ইবাদত বন্দেগি করেন। নামাজ পড়ছেন তো পড়ছেনই। নামাজ শেষ হলে তসবি। সেই তসবি টানা চলতেই থাকে।

এক-দুই দিন পর পর উনি শাহজালাল সাহেবের দরগায় গেলেন, কিন্তু আমাদের কাউকে নিলেন না। তিনি দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে যান না, তিনি সেখানে দীর্ঘ সময় কাটান। শিশুদের নেয়া মানে যন্ত্রণা। দাদাজানের সঙ্গে গিয়ে হালুয়া খাওয়া হলো না।

তিনি যে আমাদের সঙ্গে গল্প করেন না তা-না। সবাইকে ডেকে গল্প বলেন। সব গল্পই উপদেশমূলক। শেখার কিছু থাকে। গল্প শেষ করেই তিনি প্রশ্ন করেন, এই গল্প থেকে কী শিখলা বলো দেখি?

আমি প্রায় সময়ই বিরক্ত হয়ে বলি, কিছুই শিখি নাই। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

মাগরেবের নামাজের সময় তাঁর সঙ্গে আমাকে মসজিদে যেতে হয়। নামাজ জানি না তাতে কী— অভ্যাস হোক।

মসজিদ থেকে ফিরেই বই নিয়ে তাঁর সামনে বসতে হয়। তিনি পড়া জিজ্ঞেস করেন। কঠিন শিক্ষক।

একদিন তাঁর বিশাল পাঞ্জাবির একটা চুরি হয়ে গেল। চোর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পাঞ্জাবি নিয়ে গেল। আমরা খুশি। দাদাজানের একটা ক্ষতি তো হলো। আমার মা রসিকতা করে বলে বসলেন, বাবা, আপনার পাঞ্জাবি নিয়ে চোর তো বিরাট বিপদে পড়েছে।

দাদাজান বললেন, কথাটা তো মা বুঝলাম না।

মা বললেন, এত বড় পাঞ্জাবি চোর পরতেও পারবে না। কাউকে দিতেও পারবে না। কারো গায়ে লাগবে না। অর্ধেক মাটিতে পড়ে থাকবে।

দাদাজান গম্ভীর হয়ে গেলেন। হালকা ধরনের কথাবার্তা-রসিকতা তাঁর একেবারেই পছন্দ না। নানাজান যদি হন আনন্দের ঈদ, দাদাজান শোকের মহররম।

উনার চলে যাবার দিন ঘনিয়ে আসতেই আমরা খুশি। যাক, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাবে।

যাবার দিনের ঘটনা। সব শিশুর মুখে হাসি। দাদাজান রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মালামাল তোলা হয়েছে, তিনি উঠছেন না। হঠাৎ তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। নাতি-নাতনিদের ছেড়ে যেতে তাঁর না-কি খুব কষ্ট লাগছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি শেষ দফা মোনাজাতের জন্যে হাত তুললেন। আমরা হাত তুললাম, রিকশাওয়ালা হাত তুলল। একজন পথচারীও কী মনে করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাত তুলল। তাঁর প্রার্থনা এরকম—

> হে আল্লাহপাক, তুমি আমার নাতি-নাতনিদের মনে দুঃখ দিতে চাইলে অবশ্যই দিবে, কিন্তু তারা যেন কারো মনে দুঃখ না দেয়। তোমার দরবারে তাদের জন্যে বিদ্যা প্রার্থনা করি। ধন-দৌলতের বদলে তুমি তাদের দিবে বিদ্যা। একটা বেলাও তারা যেন অভুক্ত না থাকে, এইদিকে তুমি একটু নজর রাখবে। লবণ-ভাত হলেও যেন খেতে পারে।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে রিকশায় উঠলেন। পাঞ্জাবির লম্বা আস্তিনে চোখ ঢেকে রাখলেন। রিকশা চলতে শুরু করেছে। আমরাও কাঁদতে কাঁদতে রিকশার পেছনে দৌড়াচ্ছি। কী আশ্চর্য! এরকম তো হবার কথা ছিল না।

পাঠক হুমায়ূন

আমার দাদি ছিলেন অসম্ভব রূপবতী একজন মহিলা এবং অসম্ভব বোকা। বুদ্ধি মাপার IQ Test আছে। বোকামি মাপার কোনো টেস্ট নেই। থাকলে তিনি হাই মার্ক পেতেন। তিনি যে মহাবোকা, এই তথ্য আমি অল্প বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম। নাতি-নাতনিদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে এই দৃশ্য দেখলে তিনি কেন জানি খুব আনন্দ পেতেন। খুশিতে তাঁর চোখমুখ ঝলমল করত। তাঁর বোকামির একটা নমুনা দেই।

দাদাজান মারা যাচ্ছেন। তাঁর হেঁচকি উঠে গেছে। তাঁর কানের কাছে কলেমা তৈয়ব পড়া হচ্ছে। হঠাৎ দাদিজান ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনি যে মারা যাচ্ছেন কাফনের কাপড়, এইসব খরচ কে দিবে কিছু বলে গেছেন?

দাদাজান বহু কষ্টে বললেন, তোমার চিন্তা করতে হবে না, ছেলেরা যা পারে করবে।

সিন্দুকে যে আঠারো টাকা আছে সেটা কী করব?

তুমি খরচ করো।

দাদির আরো কিছু জটিল সাংসারিক প্রশ্ন ছিল, তার আগেই দাদাজান মারা গেলেন। দাদি শোকে কাতর হলেন না। তিনি অস্থির হয়ে গেলেন মৃত্যুসংবাদটা তাঁর মেয়েদেরকে কে তাড়াতাড়ি দিতে পারবে এই চিন্তায়।

আমার সঙ্গে দাদীর বৈরী সম্পর্ক ছিল। আমি অতিরিক্ত দুষ্ট ছিলাম। দাদির লক্ষ্যই ছিল কীভাবে আমাকে শাস্তি দেয়া যায়। আমি তাঁর প্রধান টার্গেট।

খেলতে গিয়ে খড়ের গাদার খড় এলোমেলো করে দিয়েছি। দাদি দৌড়ে মাকে নিয়ে এসে অপরাধের বিশদ এবং ফুলানো ফাঁপানো বর্ণনা করে বলবেন, একে মার তো বৌমা।

শাশুড়ির মন রক্ষার জন্যে মা হয়তো একটা থাপ্পড় দিলেন। দাদির শান্তি হলো না। তিনি বলবেন, এইটা কী মারলা, আরো মার, শক্ত করে মার।

দাদির নিয়ম ছিল চোখে পানি না আসা পর্যন্ত শাস্তি চলবে। ছেলেমেয়েদের শাস্তি দিতে মা'র কখনো তেমন কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু অন্যের আদেশে শাস্তি দিতে আপত্তি ছিল। তিনি বাবার কানে এই প্রসঙ্গ তুললেন। বাবা বললেন, আমার মা বোকা মানুষ। বোকা মানুষের উপর কখনো মন খারাপ করতে নেই। যখন তিনি যাকে শাস্তি দিতে বলবেন, দিবে।

মা বললেন, তুমি তো খুবই অন্যায় কথা বললে। বিনা কারণে আমি আমার ছেলেকে কেন মারব ?

বাবা বললেন, তোমার শাশুড়ি মারতে বলছেন বলেই মারবে। তিনি সকল ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে। তিনি তোমার শাশুড়ি। শাশুড়ির আবার অন্যায় কী ? তাঁর সবই ন্যায়।

আমার দাদি যে শুধু বাচ্চাদের মার খাওয়াতেন তাই না, তিনি ছেলেদের বৌদেরকে নিয়েও অনেক কথা নিজে নিজে বানাতেন এবং কাঁদতে কাঁদতে ছেলেদের কানে তুলতেন। ছেলেরা তাদের মায়ের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিল বলেই কোনো কথাই আমলে নিত না। দাদির কষ্টের চোখের জল বৃথা যেত।

যাই হোক, দাদির মারের কাছ থেকে আমি কীভাবে চিরদিনের জন্যে রক্ষা পাই সেই গল্প বলি।

দাদি একদিন আমাকে বললেন, এই পুলা, বাংলা পড়তে পারস না ?

দরগার প্রবেশপথের দু'পাশে এভাবেই সিলেটের ঐতিহ্যবাহী হালুয়া (তুশা শিন্নী), গোলাপ জল, আগরবাতি, মোম বাতি, নকুলসহ নানান ধরনের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে দোকানিরা।

আমি বললাম, পারি।

আমারে এই বইটার কয়েকটা পাতা পইড়া শুনা।

দাদি আমার হাতে 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' কিংবা 'কিচ্ছাতুল আম্বীয়া' নামের একটা বই ধরিয়ে দিলেন। আমি পড়তে শুরু করলাম। দাদি গালে হাত দিয়ে শুনছেন। আউলিয়াদের জীবনী শুনছেন, এই কারণেই হয়তো তাঁর মনে গভীর ভাব উঠল। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। ফিসফিস করে কাঁদেন। শাড়ি দিয়ে চোখ মোছেন।

এরপর রোজকার রুটিন হলো— দুপুরের খাবার পর নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ। এর মধ্যে প্রধান গ্রন্থটির নাম 'বিষাদ সিন্ধু'। দাদির সঙ্গে তখন আরো কিছু বৃদ্ধ মহিলাও জুটেছেন। তাঁরাও চোখের পানি ফেলায় এক্সপার্ট। একজন আবার আসরে আসেন অজু করে। 'বিষাদ সিন্ধু' পাঠ শোনা সোয়াবের কাজ। যে-কোনো সোয়াবের কাজ করতে হয় অজু করে। 'বিষাদ সিন্ধু' পড়তে পড়তে আমি নিজেও বৃদ্ধাদের সঙ্গে অনেকবার কাঁদলাম। কী অপূর্ব গতিময় ভাষা। কী বর্ণনা ভঙ্গি।

> না না আমি যে আজকাল করিয়া কয়েক দিন কাটাইয়াছি, তাহার অনেক কারণ আছে। আমি আজ আর কিছুতেই থাকিব না। লোকের কাছে কী করিয়া মুখ দেখাইব ? হাসনেবানু, জয়নাব, সাহরে বানু এই তিনজনই আজ আমার নাম করিয়া অনেক কথা কহিয়াছে। দূর হইতে তাহাদের অঙ্গভঙ্গি ও মুখের ভাব দেখিয়াই আমি জানিয়াছি যে সকলেই সকল কথা জানিয়াছে।

দাদির গুডবুকে আমার নাম উঠে গেল। এখন আমার দুষ্টুমী তিনি দেখেও দেখেন না। একদিন কী এক অপরাধে মা আমাকে মারছেন, দাদি চিলের মতো উড়ে এলেন। মা'র হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, বৌমা, তুমি তো আদব কায়দা কিছুই শেখ নাই। শাশুড়ির সামনে হাত চালাইতেছ। লজ্জা নাই ? আর যেন এই জিনিস না দেখি।

প্রায়ই মনে হয়— ইশ, আমার দাদিকে আমি যদি আমার নিজের লেখা একটা বই পড়ে শোনাতে পারতাম! বৃদ্ধা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন। গভীর আগ্রহে শুনছেন। চোখের পানি ফেলছেন। কী অসাধারণ ব্যাপারই না হতো! পরকালে কি দাদির দেখা পাব ? সেখানে কি আমার লেখা কোনো বই থাকবে ? আমি তাঁকে পড়ে শোনাতে পারব ? বড় ইচ্ছা করে।

পৃথিবীর সবচে' বড়

পৃথিবীর সবচে' বড় ঘড়ি কোনটা ? পৃথিবীর সবচে' বড় ডেগ (পাতিল) কোথায় আছে এবং কত বড় ? পৃথিবীর সবচে' বড় মাছের নাম কী ? সেই মাছ কোন দেশে পাওয়া যায় ? পৃথিবীর সবচে' বড় লোহার ব্রিজটা কোথায় ? পৃথিবীর কোন দেশে সোনার মাছ পাওয়া যায় ?

অনেকদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল সবই সিলেট শহরে। পৃথিবীর সবচে' বড় ঘড়ি আলী আমজাদের ঘড়ি। আমি যখন ছোট, এই ঘড়িটা চলত। আমি ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতাম ঘড়ির মিনিটের কাঁটার ঘূর্ণন বোঝা যায় কি-না এটা বোঝার জন্যে। আমাকে ঘড়ি দেখে সময় বলা শেখানো হয় এই ঘড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে। যিনি আমাকে শেখান তিনি আমার ছোট চাচা, নাম আজিজুর রহমান আহমেদ। আমি চাচাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চাচা, এটা কি পৃথিবীর সবচে' বড় ঘড়ি ? চাচা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, অবশ্যই।

পৃথিবীর সবচে' বড় পাতিল শাহজালাল সাহেবের দরগায়; এমন ধারণাও ছিল। ডেগে টাকা-পয়সা ফেলার রেওয়াজ ছিল। এখনো নিশ্চয়ই আছে। টাকা-পয়সা ফেলার জন্যে আমাকে অনেক উপরে তোলা হতো। প্রতিবারই মনে হতো, এত বড়!

শৈশবে ধরেই নিয়েছিলাম, পৃথিবীর সবচে' বড় মাছ দরগার গজার মাছ। নীল-তিমি অবশ্যই না। আমাকে বলা হয়েছিল গজার মাছগুলো আসলে মাছ না, অভিশপ্ত জ্বিন। গজার মাছ মারা গেলে তাদের নাকি যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে কবর দেয়া হয়।

শাহজালাল (র.) সাহেবের দরগায় সোনার মাছ ছিল। কুয়াভর্তি সোনালি রঙের মাগুর, কৈ মাছ। তাদের গায়ের হলুদ রঙ ঝকমক করত। যে কুয়ায় এই মাছগুলো থাকত সেই কুয়ার সঙ্গে না-কি যোগাযোগ ছিল মক্কা শরিফের আবে জমজমের। সোনার মাছভর্তি কুয়ার পানি ছোটবেলায় ভক্তিভরে খেয়েছি। সোনার

মাছগুলোর কী হলো ? মাছের এমন অপূর্ব সোনা রঙের কারণটাইবা কী ? প্রাণী বিজ্ঞানীরা কী বলেন ? ঐগুলো কি বিশেষ কোনো প্রজাতির মাছ ছিল ?

পৃথিবীর সবচে' বড় লোহার ব্রিজটা অবশ্যই সুরমা নদীর উপরের লোহার ব্রিজ, ক্বীন ব্রিজ।

আরেকটা বাদ পড়ে গেল। পৃথিবীর সবচে বড় লাইব্রেরি— কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের লাইব্রেরি। প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার লাইবেরিও না, ব্রিটিশ মিউজিয়ামও না।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শহর কোনটা ?

অবশ্যই সিলেট শহর। শৈশবে তাই মনে করতাম, এখনো করি। সিলেটে যতবার যাই, শান্তি শান্তি ভাব হয়। আমার ছোট ভাই জাফর ইকবাল সিলেটকে তার কর্মস্থল হিসেবে এই কারণেই কি বেছে নিয়েছে ? সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা-না।

আমার ছোট চাচা তো সিলেটেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। বাবার সঙ্গে সিলেট শহরে গিয়েছিলেন একসময়, বাবা বদলি হয়ে দিনাজপুর চলে গেলেন। ছোট চাচা সিলেটের মায়া কাটাতে পারলেন না, সেখানেই থেকে গেলেন। ছোট একটা লাইব্রেরি করলেন। দুঃখে-কষ্টে জীবন পার করলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে ময়মনসিংহে পারিবারিক গোরস্থানে কবর দেয়ার প্রস্তাব উঠল। সেটা করা গেল না, কারণ চাচা তাঁর শেষ ইচ্ছায় বলেছেন, তাঁর কবর যেন এই পবিত্র শহরেই হয়।

তাঁকে সিলেটেই কবর দেয়া হয়েছে।

ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী

তখন আমরা ভাইবোন তিনজন। আমি, শেফু, ইকবাল। ইকবাল ছোট। সে ঘর এবং বারান্দায় ঘুরঘুর করে। বাইরে বের হবার বয়স হয় নি। শেফু ঘুরে আমার পেছনে। মেয়েদের সব মায়েরাই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করে। শেফু জামা-কাপড়ে সে কারণেই ঝলমল করে। এমনিতেও তার পরিষ্কার বাতিক আছে। দুই ভাই-বোন মনের আনন্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই দৃষ্টিনন্দন ছিল।

শেফুকে নিয়ে কত জায়গায় না গিয়েছি। মারামারিতেও অনেকবার সে অংশ নিয়েছে। বড় ভাই মার খাবে, সে ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে; এটা হবার নয়। তার রাগ এবং জেদ দুটাই বেশি।

তাকে নিয়ে ঘুরতে বের হবার একটা ক্ষুদ্র সমস্যা ছিল। কোথাও পড়ে গিয়ে সে যদি ব্যথা পায় তাহলে সর্বনাশ। যেখানে পড়েছে সেখানেই সে শুয়ে থাকবে। চিৎকার করবে, কাঁদবে। মাকে এসে তাকে শান্ত করে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে। অন্য কেউ নিয়ে গেলে হবে না। অনেকবার এমন হয়েছে—আমার বড় মামা, ছোট চাচা কিংবা বাইরের কেউ কোলে করে তাকে বাসায় নিয়ে এসেছেন। কোল থেকে নামানো মাত্র সে দৌড়ে আগের জায়গায় চলে যাবে। শুয়ে পড়বে, কাঁদতে থাকবে। মা'কেই যেতে হবে। শিশুরা কত বিচিত্রই না হয়!

বোনের জন্যে আমার খুব টান ছিল। কোথাও মজার কিছু দেখেছি, দৌড়ে বাসায় ফিরে বোনকে সেই দৃশ্য দেখাই নি; এমনটি কখনো হয় নি। একবার হঠাৎ হাতির গলার ঘণ্টার আওয়াজ পাওয়া গেল। দৌড়ে বোনকে নিয়ে গেলাম। একদল ছেলেমেয়ে হাতির পেছনে পেছনে যাচ্ছে, আমরাও যাচ্ছি। হাতি অনেক বাড়ির সামনে থামছে। বাড়ির মহিলারা কুলায় করে হাতিকে চাল দিচ্ছেন। হাতি শুঁড় তুলে মহিলাকে সালাম দিচ্ছে। কী অদ্ভুত দৃশ্য! হাতির পেছনে পেছনে

আমরা শহরের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম। তারপর আর ফিরতে পারি না। কীভাবে কোন পথে ফিরব তাও জানি না। দু'একজনকে মীরাবাজার যাবার পথ জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল, মীরাবাজার ? কোন মীরাবাজার ?

যে পথে হাতি এসেছে, সেই পথ ধরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছুদূর যাবার পর এক জলাভূমির কাছে এসে পড়লাম। এক পাল শূকর সেখানে ঘুরছে। শেফু কাঁদতে থাকল। সেই সময়ে মানুষজন ভালো ছিল। তাদের হৃদয়ে মমতা ছিল। তেমনই একজন রিকশায় করে আমাদের পৌঁছে দিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে সরাসরি মা'র হাতে তুলে দেয়া। আমাদের পরম সৌভাগ্য, মা বাসায় ছিলেন না। কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছেন। হাতিবিষয়ক কোনো জটিলতা তৈরি হলো না।

পৃথিবীর সবচে' বড় ডেগ ? শৈশবে তাই মনে হতো।

যখনকার কথা বলছি তখন সারা দেশে মন্বন্তর শুরু হলো। সন-তারিখ বলতে পারব না, অভাবের তীব্রতা বলতে পারব। থালা হাতে দিনের মধ্যে কতবার যে ক্ষুধার্ত মানুষ আসছে। আমাদের বাসার খানিকটা দূরে সিলেটের বিত্তবান একজন মানুষ লঙ্গরখানা দিলেন। এক বেলার লঙ্গরখানা। দিনে একবার, দুপুরে, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ানো হবে।

বিশাল আয়োজন। মাঠভর্তি মানুষ থালা, কলাপাতা নিয়ে অপেক্ষা করছে। বড় বড় ডেগভর্তি খিচুড়ি (কিংবা লাবড়া) রান্না হচ্ছে। আমি সারাদিন ঐ মাঠেই থাকি। গভীর আগ্রহে খিচুড়ি রান্না দেখি। দুপুরে সবাইকে যখন খেতে দেয়া হচ্ছে, তখন আমিও একটা কলাপাতা নিয়ে দলের সঙ্গে বসে গেলাম। মহানন্দে খাওয়া-দাওয়া করলাম। খুবই স্বাদু রান্না। এরপর থেকে আমার দুপুরের খাওয়া লঙ্গরখানায়।

এত ভালো খাবার আমি একা খাচ্ছি, বোনকে খাওয়াচ্ছি না, এটা কেমন কথা! একদিন শেফুকে নিয়ে গেলাম। দু'জনে দু'টা কলাপাতা নিয়ে দলের সঙ্গে বসে গেলাম। পরিবেশনকারী খিচুড়ি দিতে এসে শেফুর সামনে থমকে দাঁড়ালেন। সুন্দর জামাকাপড় পরা ফুটফুটে এক মেয়ে। সে এখানে কেন?

তুমি কোন বাড়ির গো?

আমি শেফুকে চোখে ইশারা করলাম কিছু না বলতে। সে চোখের ইশারা বুঝল না। আঙুল উঁচিয়ে বাড়ি কোন দিকে দেখাল।

তোমার বাবা কোথায়?

অফিসে।

আচ্ছা খাও।

কলাপাতা ভর্তি খিচুড়ি দেওয়া হলো। আমার মনে হলো বিপদ কাটা গেছে। দুই ভাইবোন মহানন্দে খিচুড়ি শেষ করলাম। বিপদ কিন্তু কাটে নি। খাওয়া শেষ হতেই পরিবেশনকারী আমাদের সামনে উপস্থিত। আমি ইচ্ছা করলেই দৌড় দিয়ে পালাতে পারতাম। শেফু পারবে কি-না এই ভেবে দৌড় দিলাম না। ভদ্রলোক আমাদের অ্যারেস্ট করে বাসায় নিয়ে গেলেন। মাকে সব খুলে বললেন। মা কেঁদে কেটে অস্থির। ছেলে-মেয়েরা তাঁর সম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। ভিখিরিদের সঙ্গে নিয়মিত লঙ্গরখানায় খাচ্ছে। এর মানে কি এই না যে, বাসায় তাদের খেতে দেয়া হয় না? আমাদের আটকে রাখা হলো। বাবা ফিরলে শাস্তি হবে। তারপর ছাড়া পাব। আজকের শাস্তি যে ভয়াবহ হবে এই বিষয়ে মা আমাদের অবহিত করলেন। মন খুবই খারাপ হয়ে গেল।

বাবা ফিরলেন সন্ধ্যায়। মা'র কাছে ঘটনা শোনেন, আর হো হো করে হাসেন। তিনি কেন হাসছেন এটা মা বুঝতে পারেন না। আমরাও বুঝতে পারি না। বাবার হাসি থামে না।

এই দুইজন নিয়মিত লঙ্গরখানায় খায়? হা হা হা।

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বাবা বললেন, খাওয়া তা সে যেখানেই হোক কখনো অপরাধের মধ্যে পড়ে না। তবে নিরন্ন মানুষের খাবারে ভাগ বসানো অন্যায়। ঠিক আছে যাও।

পরে মা'র কাছে শুনেছি, আমরা বাবার সামনে থেকে চলে যাবার পর তিনি মা'কে বলেছেন, এই চল আমরা দু'জন একদিন খেয়ে আসি।

আমার দ্বিতীয় বোনের জন্ম হলো এই সময়। সুন্দর গায়ের রঙ। রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে বাবা তাঁর চতুর্থ সন্তানের নাম রাখলেন 'অগ্নিশিখা'। কিছুদিন পর

'অগ্নি' বাদ পড়ল, হলো 'শিখা'। তার কিছুদিন পর 'শিখু'।

মা'র শরীর তখন খুবই খারাপ। আমাদের দুই ভাই বোনের উপর ভার পড়ল শিখুর দেখাশোনার। আমরা দুই ভাইবোনই যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে (এবং আনন্দের সঙ্গে) এই কাজ করতে লাগলাম। বাটিতে দুধ নিয়ে, দুধে ফিতা ভিজিয়ে তার মুখে ধরতেই সে চুকচুক করে খেত। ফিতা মুখ থেকে টেনে বের করা যেত না। আধবাটি দুধ এইভাবে খাওয়াতে অনেক সময় লাগত। আমরা দুই ভাইবোন মোটেও বিরক্ত হতাম না।

মাঝে মাঝে শিখুকে আমার কোলে শুইয়ে দেয়া হতো। সে ঘুমাত। আমি মূর্তির মতো বসে থাকতাম। নড়াচড়া করলে যদি তার ঘুম ভাঙে। চারটি সন্তানের জন্ম দিয়ে মা তখন কাবু হয়ে গেছেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। মেজাজ হয়েছে খিটখিটে। অতি অল্প অপরাধে কঠিন কঠিন শাস্তির বিধান দিচ্ছেন, যেমন আমার এবং শেফুর হাত ধরে কুয়ার উপর ঝুলিয়ে রাখা। কুয়াতে ছেড়ে দেবার ভয় দেখানো। [এই বিষয়টা *আমার ছেলেবেলায়* বিস্তারিত লিখেছি বলে এখানে আর লিখলাম না।]

শেফুর প্রতি আমার বড় ধরনের কৃতজ্ঞতা আছে। হুমায়ূন আহমেদকে লেখক হুমায়ূন আহমেদ তৈরি প্রক্রিয়ায় তারও ভূমিকা আছে। প্রসঙ্গটা বলি। বাবা আমাকে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সদস্য করে দিয়েছিলেন, এই তথ্য আগে দিয়েছি। বিশাল এই লাইব্রেরি মীরাবাজার থেকে অনেকখানি দূরে। তিন কিলোমিটারের বেশি হবার কথা। রিকশায় করে সেই লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেতে হতো হেঁটে। নিতান্তই এক বালকের জন্যে আসা-যাওয়ায় ছয় কিলোমিটার পার করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এই দীর্ঘ পথ একা যাওয়া সম্ভব না। আমার সঙ্গী ছিল শেফু। ছোট ছোট পায়ে আমরা হাঁটছি তো হাঁটছি। পথ ফুরাচ্ছে না। জায়গায় জায়গায় বিশ্রামের জন্যে থামছি। আবার হাঁটছি। লাইব্রেরিতে পৌছে হাতে গল্পের বই পাওয়ার পর আমার সব ক্লান্তি শেষ, কিন্তু বোনটির প্রাপ্তি কী ? সে তো গল্পের বই পড়ে না। সে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে শুধু ভাইকে সঙ্গ দেবার জন্যে।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা, যে ছোট্ট শিশু শুধু ভাইকে সঙ্গ দেবার জন্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে, তার জীবনে যেন কখনো সঙ্গীর অভাব না হয়। জীবনের দীর্ঘ পথে কেউ না কেউ যেন মমতা ও ভালোবাসায় তাকে সঙ্গ দেয়।

শেফু আজ কোনো একটা সরকারি কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (কিংবা ফুল প্রফেসর, ঠিক জানি না। যোগাযোগ নেই), পড়ায় বাংলা সাহিত্য।

মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে তার ক্লাসে গোপনে উপস্থিত হই। তার ছাত্রদের সঙ্গে বসে শুনি সে কীভাবে পড়ায়। তিন কন্যা এবং স্বামীকে নিয়ে আজ তার সুখের সংসার। বড় মেয়ে শর্মির বিয়ে হয়েছে। সে চলে গেছে বহু দূরের দেশ জার্মানিতে। কয়েকদিন আগে গভীর রাতে জার্মানি থেকে এই মেয়েটি টেলিফোন করে কান্না কান্না গলায় বলল, বড়মামা, দোয়া করবেন।

আমি বললাম, দোয়া লাগবে কেন ? কী সমস্যা বলো ?

বড়মামা, আমার বাচ্চা হবে।

যে ছোট্ট শেফুকে নিয়ে শৈশব যাপন করেছি তার মেয়েটির সন্তান হবে ? কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। কী অপূর্ব কী নিখুঁতই না এই জীবনচক্র!

আমি দীর্ঘ জীবন সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় পার করে দিলাম। কত জোছনা বিধৌত রাত্রি! কত না বৃষ্টি ভেজা দিন! ভুবনের মহত্তম সঙ্গীতের মতো নবজাতকের কান্না শুনে কতবারই না অভিভূত হয়েছি! আবার সন্তান হারানোর দুঃখে ত্রিভুবন পাথর করে দেয়া মায়ের আর্তচিৎকারও শুনেছি। লেখক হিসেবে আমি ভাগ্যবান। পরম করুণাময় প্রতিনিয়তই আমাকে শেখাচ্ছেন।

জগদ্দলের দিন

শেষ পর্যন্ত বাবার প্রমোশন হয়েছে। তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছেন। তাঁকে বদলি করা হয়েছে দিনাজপুরের জগদ্দলে। তিনি আমাদের মীরাবাজারে রেখে চলে গেছেন। আমাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। কারণ একটাই, তিনি এখন বর্ডার ইন্সপেক্টর [তখন বর্ডার ছিল পুলিশের হাতে। সীমান্ত রক্ষী, বিডিআর জাতীয় কিছু তৈরি হয় নি।] যে সীমান্তে তাঁর পোস্টিং, তার ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের মধ্যে কোনো স্কুল নেই। জগদ্দলে বাচ্চাদের নিয়ে গেলে তাদের পড়াশোনার কী হবে ? ছেলেমেয়ে স্ত্রী পাশে না পেয়ে তাঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছিল। আমি কিন্তু সুখেই আছি। বাবা না থাকায় পূর্ণ স্বাধীনতা। সন্ধ্যা পার করে ফিরলেও ভয়ের কিছু নেই। মা মারধোর করে করুক। বাবার কঠিন চোখের সামনে তো দাঁড়াতে হচ্ছে না।

জীবনের প্রথম চিঠি পেলাম এই সময়ে। বাবা জগদ্দল থেকে চিঠি লিখলেন। চিঠির বিষয়বস্তু মনে নেই, শুধু মনে আছে দীর্ঘদিন এই চিঠি পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরেছি। বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে বলেছি, বাবার চিঠি। নিজেকে বড় বড় লাগতে লাগল, কারণ বড়রাই চিঠি পায়।

ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে উঠলাম। বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ টাইপ উঠা। খুব খারাপ রেজাল্ট। বাবা থাকলে ব্যাখ্যা করতে হতো এত খারাপ কেন ? মা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে মাথা ঘামান না। ছেলে ক্লাস ফোরে উঠেছে ? এই যথেষ্ট। হেডমাস্টার সাহেব বলেছেন, এই ছেলে ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে উঠবে কানে ধরে। ঠিকই বলেছেন। ছাত্রদের সব সময় শাস্তির উপর রাখতে হয়।

হঠাৎ একদিন আমার স্বাধীনতার সোনালি দিন শেষ হলো। মীরাবাজারের মায়া কাটিয়ে আমরা রওনা হলাম জগদ্দলের দিকে। একটাই আনন্দ— পড়াশোনা করতে হবে না। তবে আমাদের সঙ্গে দায়িত্ববান শিক্ষক একজন যাচ্ছেন। তিনি স্কুলের মতোই সকাল দশটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আমাদের পড়াবেন। আমাদের শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ড, ডাস্টার এবং একগাদা চক সঙ্গে

নিচ্ছেন। স্কুলের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সিরিয়াস। আমাদের এই স্কুল শিক্ষকের নাম ফজলুল করিম। আমাদের বড়মামা। হঠাৎ তাঁকে জগদ্দলে যেতে হচ্ছে বলে তিনি হতাশ ভাব করছেন। কারণ এই বছরে নাকি তাঁর প্রিপারেশন ডিভিশান পাওয়ার মতো। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বসলেই ডিভিশান। তবে তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নির পড়াশোনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তিনি যাচ্ছেন। তাঁর প্রিপারেশন তো থাকলোই। যে কোনো এক ফাঁকে ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে দেবেন।

জগদ্দলে পৌঁছে আমি মুগ্ধ। হঠাৎ যেন স্বর্গের কাছাকাছি কোনো জায়গায় এসে পড়েছি। জন স্টেনবেকের Pastures of Heaven.

জনমানবশূন্য একটি অঞ্চল। জঙ্গলের ভেতর বাড়ি। সেই জঙ্গলও ঘন জঙ্গল। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসে না এমন অবস্থা। মাঝে মাঝে পায়ে চলার পথ। হঠাৎ হঠাৎ সাঁওতাল রমণী, মাথায় লাকরির বোঝা। একটু পরে পরেই আম-বাগান। গাছগুলোর সাইজ বটগাছের মতো।

সেখানকার বিশাল জমিদার বাড়ির চারটা কামরায় বাবা সংসার পেতেছেন। জমিদার বাড়ির বাকি কামরাগুলো তালাবন্ধ। কী রহস্যময় সেই রাজপ্রাসাদ। আমার কাছে মনে হলো বাড়ির ছাদ প্রায় আকাশের কাছাকাছি। মেঝে মার্বেল পাথরের। আয়নার মতো পাথর। তাকালেই মুখ দেখা যায়। বাড়ির ভেতরই এক মন্দির। মন্দিরে শিব-পার্বতীর ছবি। মন্দির ভর্তি বিচিত্র সব জিনিসপত্র। যেমন পিতলের কলসি ভর্তি ঝকঝকে সাদা কড়ি।

দেশভাগের পর জমিদার সাহেব বাড়িঘর ছেড়ে কোলকাতা চলে গেছেন। তাঁর বসতবাড়ি চলে এসেছে সরকারের জিম্মায়। পুলিশ রক্ষণাবেক্ষণ করছে। বাবা কঠিনভাবে জিম্মাদারের ভূমিকা পালন করছেন। সব ঘরের চাবি তাঁর কাছে। তিনি কোনো ঘর খুলবেন না। ঘরের ভেতর কী আছে জানার কোনো উপায় নেই।

আমার আনন্দের কোনো সীমা রইল না। কী রহস্যময় জায়গাতেই না আমরা থাকতে এসেছি! বাড়ির একটু দূরে জমিদার সাহেবের মোটরগাড়ি। গাড়ি ভেঙেচুরে গিয়েছে। চারদিকে জঙ্গল গজিয়েছে, কিন্তু সিটগুলি ঠিক আছে। গাড়ির স্টিয়ারিং ঠিক আছে। যে-কোনো সময় সিটে বসে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালানো-খেলা খেলা যায়।

জমিদার সাহেবের বাড়িতেই ইলেকট্রিসিটির জন্যে জেনারেটর বসানো। সব ভেঙে গেছে, তারপরেও যন্ত্রপাতি ঠিক আছে। অনেক ধরনের খেলা এইসব যন্ত্রপাতি দিয়ে খেলা যায়। জমিদার তার একটা কুকুরও ফেলে গিয়েছিলেন। এত বড় কুকুর আমি আমার জীবনেও দেখি নি। এলশেসিয়ানের চেয়েও বড়

সাইজ। সাধারণত কুকুরশ্রেণী ইংরেজি ভাষা ছাড়া বুঝে না। এ বুঝে। 'আয় রে টাইগার' বলে ডাক দিলেই পেছনে পেছনে আসে।

আমরা ভাইবোনরা যেখানে যাই কুকুরটা সেখানে যায়। ভাবটা এরকম যে, সে আমাদের রক্ষক। মা নিজেও কুকুরের কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ। মেঝেতে খাবার দিলে সে খায় না। তাকে প্লেটে খাবার দিতে হয়।

এই কুকুরটা তার নিজের জীবন দিয়ে আমার ছোট ভাই আহসান হাবীবের জীবন রক্ষা করেছিল। একটা কেউটে সাপ ফণা তুলে আহসান হাবীবকে ছোবল দিতে এসেছিল, তখন বিদ্যুৎ গতিতে এই কুকুর লাফ দিয়ে পড়ে সাপটার ফণা কামড়ে ধরে। অন্য কোথাও এই ঘটনাটা বিস্তারিত লিখেছি বলে এখানে আর লিখলাম না।

রাজবাড়িতে আমাদের জীবন হলো মহান আবিষ্কারকের জীবন। রোজই কিছু না কিছু আবিষ্কার করি। একদিন আবিষ্কার করলাম জমিদার সাহেবের ছাপাখানা। ছোট্ট ছাপাখানা। ট্রেডল মেশিন আছে। পায়ে চাপ দিলে মেশিন চলে। খোপ ভর্তি সিসার টাইপ। প্রতিটি টাইপের মাথা পানিতে চুবিয়ে ছাপ দিলেই লেখা উঠে। জীবনে প্রথম ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখলাম সেখানেই। টাইপ খুঁজে খুঁজে লেখা হলো—

'হমযন'

আকার উকার খুঁজে না পেয়ে হমযন নাম নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

একদিন বস্তাবন্দি লাইব্রেরির খোঁজ পেলাম। শত শত বই বস্তায় ভর্তি করে রাখা হয়েছে। জমিদার সাহেব হয়তোবা বস্তা ভর্তি করে বই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কোনো এক কারণে নিতে পারেন নি। বইগুলো আমাকে তেমন আকর্ষণ করে নি, কারণ সবই ইংরেজি বই। শুধু একটা বই আমাকে খুব মুগ্ধ করল। বইটার পাতায় পাতায় শুধুই রেল ইঞ্জিনের ছবি। আধো আলো আধো অন্ধকারে কত দিন যে এই বইটির পাতা উল্টেছি!

আমাদের পড়ানোর দায়িত্ব বড়মামার। তিনি কিছুই করলেন না। ব্ল্যাক বোর্ডটা একটা আমগাছে শুধু পেরেক দিয়ে বসানো হলো— এই পর্যন্তই। বড় মামা শিকারি হিসেবে আবির্ভূত হলেন। বাবার বন্দুক এবং ছররা গুলি নিয়ে তিনি প্রতিদিনই বনমোরগ শিকারে বের হতেন। প্রায়ই বনমোরগ মেরে আনতেন।

একবার গভীর জঙ্গল থেকে নীল গরু মেরে আনলেন। নীলগরু হচ্ছে বন্য গরু। বনেই থাকে। গায়ের রঙ নীলচে। মহিষের মতো প্রকাণ্ড সাইজ।

নীলগরুর মতো প্রাণী বধ করার পর তিনি নিজেকে হয়তোবা সুন্দরবনের আর্জান সর্দার ভাবতে লাগলেন। রাতে প্রায়ই তাঁকে পাওয়া যায় না। পুলিশের একজন সুবেদার এবং পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিয়ে তিনি জঙ্গলে চলে যান। আচমকা একদিন মামার শিকারি জীবনের অবসান ঘটল। কারণ তাকে বাঘে তাড়া করেছিল। তিনি কোনোক্রমে জীবন নিয়ে ফিরেছেন। সারাপথেই আল্লাহকে বলেছেন, এই দফায় প্রাণ রক্ষা পেলে তিনি আর কোনোদিন জঙ্গলে ঢুকবেন না। মামা তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

জগদ্দলের হিরন্ময় দিনগুলোর মধ্যে কিছু দিন ছিল একেবারেই আলাদা। বাবার সঙ্গে জঙ্গল ভ্রমণ। গুলিভর্তি রাইফেল হাতে নিয়ে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতেন। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প আলো আসছে। থমথমে জঙ্গল। বিচিত্র সব পাখি ডাকছে। বুনোফুলের গন্ধ। পরিষ্কার বনে চলার পথ। বিচিত্র বন্য ফল। একবার বাবার সঙ্গে বনে হাঁটতে গিয়ে একটা লিচু গাছ পেয়ে গেলাম। গাছভর্তি লিচু। সব পেকে গেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে গাছে আগুন লেগেছে। জীবনে প্রথম হাত দিয়ে গাছ থেকে পেড়ে পাকা লিচু খেলাম। সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

দুপুরে নিয়মিত বর্ডারে যেতাম। ছোট্ট একটা নদী হলো বর্ডারের সীমানায়। নদীর পানি ডিসটিল্ড ওয়াটারের চেয়েও পরিষ্কার। চকচকে বালির উপর দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে। নিচের প্রতিটি বালিকণা আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে। নদীর দুই পাড়েই বিস্তৃত বালির চর। আমরা দুপুরের গোসল নদীতে সারতাম। নদী পার হয়ে ইন্ডিয়ার মাটিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। প্রবল রোমাঞ্চ বোধ হতো। কী আশ্চর্য! বিদেশ ভ্রমণ করছি!

জমিদার সাহেব নদীর পাড় ঘেঁষে সিমেন্টের বসার বেঞ্চ বানিয়েছিলেন। হয়তো তিনি বিকেলে বেড়াতে এসে বেঞ্চে বসে সূর্যাস্ত দেখতেন। তিনি নেই, তাঁর স্মৃতি পড়ে আছে। পাখি উড়ে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে।

শৈশবের কথা মনে হলেই রহস্যময় জগদ্দলের কথা মনে পড়ে। সামনে ধু ধু নদীর চড়ের ভেতর দিয়ে ফিতার মতো রূপালী নদী। পেছনে ঘন জঙ্গল। এই জায়গাতেই পৃথিবীর সমস্ত রূপ এবং রহস্য একটি বালকের চোখে ধরা দিয়েছিল। ধন্য হয়েছিল তার মানব জীবন।

শেষ কথা

বৃষ্টি দিয়ে শুরু করেছিলাম, বৃষ্টি দিয়ে শেষ করি। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আমি কী একটা অপরাধ যেন করেছি। কী অপরাধ মনে নেই। যে সারাক্ষণ অপরাধ করে সে কি আর অপরাধের হিসাব রাখে? মা খুব রাগ করলেন। আমাকে কুয়ার উপর ঝুলিয়ে শাস্তি দিবেন, সেই উপায় নেই। তাঁর পক্ষে সম্ভব না। প্রধান দুই শাস্তিদাতা বড় মামা এবং ছোট চাচাও নেই। মা কয়েকবার চেষ্টা করলেন আমাকে ধরবার। আমি প্রতিবারই ফসকে বের হয়ে গেলাম। রাগে অস্থির হয়ে তিনি সদর দরজা খুললেন এবং কঠিন গলায় বললেন— 'তুই এই মুহূর্তে বের হয়ে যা। জীবনে আর কোনোদিন বাড়িতে ঢুকবি না। তোর জন্যে কোনো ঘরবাড়ি নেই। তুই ঘুরবি মানুষের দরজায় দরজায়।'

কঠিন অভিশাপ। পবিত্র মহিলার অভিশাপ বলে কথা। অভিশাপ লেগে গেল। আমি ঘরে থেকেও গৃহী না। আর লেখালেখি নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায়ই তো ঘুরছি। মা-বাবার অভিশাপকে আল্লাহপাক আশীর্বাদে রূপান্তরিত করেন। আমার বেলাতেও তাই হয়েছে। মা'কে অভিশাপ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

আমার কথা ফুরালো,
নটে গাছটি মুড়ালো।
কেনরে নটে মুড়ালি...
ইত্যাদি।

পাদটিকা

শৈশবের বন্ধুদের নামের তালিকায় কিছু উলট-পালট হবার সম্ভাবনা আছে। 'টগর'-এর জায়গায় 'উনু' হতে পারে।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আমার সঙ্গে ছোট বোন শেফু যেত। মাঝে মাঝে ইকবালও যেত। সে ছোট বলে এতদূর হাঁটতে পারত না। সে যেত হঠাৎ হঠাৎ। লেখায় তার কথা বাদ পড়ে গেছে।